With Best Complements From

AN ISO-9001
CERTIFIED
COMPANY

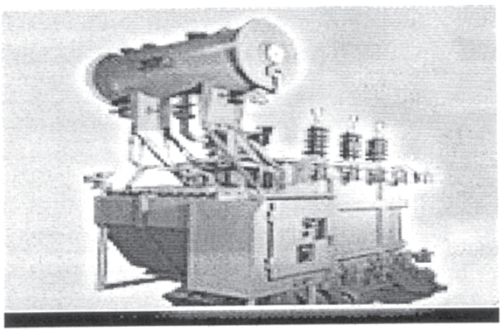

EIU EIU

East India Udyog Limited

145, G.T. ROAD, SAHIBABAD
GHAZIABAD - 210 005 (UP)

Phone : [0120] 4105890
e-mail : eiulgbd@vsnl.com
eiulgbd@rediffmail.com
URL : www.eastindiaudyog.com

Manufacturers of :
"ETS" MAKE POWER & DISTRIBUTION
TRANSFORMERS UPTO 15 MVA & 33 KV CLASS

উপন্যাস

সমুদ্রাবিত অনুত্তম

শেখর সেনগুপ্ত

মেঘের জন্য আবহাওয়া দপ্তরের তল্লাশি শেষ, আগামী সাত দিনে ছিটেফোঁটা বৃষ্টিরও সম্ভাবনা নাস্তি। সূর্যের দাবদাহের সঙ্গে ভোটের তাপ। টিভির স্ক্রিনে ঘন ঘন বিজ্ঞাপন— শাসক দলের উচ্চকোটি আত্মস্তুতি।

এখানে তিনজনই কমবেশি নিষ্প্রভ। প্রথমজন অনুত্তমের লেখক মামা শিখর দত্তগুপ্ত। আর একখানা গোয়েন্দাকাহিনি লেখার বরাত এসেছে। উপাদান খুঁজতে ভাগ্নের বাড়িতে হানা দেওয়া। পুরনো কোষ্ঠকাঠিন্য। তাই বুক পকেটে যেমন জোড়া কলম, হাতেও তেমনি চিরকালের মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়ার শিশি। দ্বিতীয় চেয়ারে অনুত্তম চৌধুরী। মাত্র দিনকয়েক আগে রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তর থেকে অবসর নিয়ে যেন হাঁফ সামলাতে পারছে। যে হারে রাজ্যে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় হরেক কিসিমের অপরাধ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তাতে ঝানু ব্যক্তিত্বের অফিসারদের পক্ষে তল্পিতল্পা গুটিয়ে অন্য রাজ্যে পাড়ি দেওয়াটাই স্বস্তিদায়ক। খুব মোক্ষম সময়ে হাত ধুয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে অনুত্তম।

তৃতীয় চেয়ারে যথারীতি আসীনা অনুত্তম-ঘরণি আঁখি চৌধুরী। অনুত্তমের সঙ্গে দেহে-মনে মিলেমিশে কাটিয়ে দিল তিন দশকের ওপর। একমাত্র ছেলে ভারত সরকারের পদস্থ আমলা। স্ত্রী-কন্যা সমেত এখন আছে কাণ্ডালায়। সপ্তাহে দূরভাষে মায়ের সঙ্গে একবার দু'বার বাক্যালাপ হবেই। আঁখির দুই আঁখি এখনও ঝকঝকে। আড়াই ভরির বিছেহার তার গলায়, যে কোনো সময় ছিনতাই হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আর তা যদি হয়ও এই নিয়ে কুরুক্ষেত্র হবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। কারণ এর চেয়ে সহস্রগুণ বড় অপরাধ হালফিল আকছার।

অনেকক্ষণ ধরে কথাটথা চলছে। বেশিটাই আঁখির সঙ্গে লেখক মামার। অনুত্তম গোবেচারি মুখ করে নীরব শ্রোতা। অনুত্তমের সফল গোয়েন্দাগিরির পশ্চাতে আঁখিরও যে কিছু অবদান থেকেছে, এ তথ্য আলবত আপনাদের অজানা নয়। এখন অনুত্তম চাকরি থেকে অবসর নেওয়ায় আঁখির কাছেও দিনগুলি যে কার্যত ফিকে হয়ে আসবে, তাও আপনারা খানিক বুঝতে পারছেন নিশ্চয়। ডান হাতের তর্জনী টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে আঁখি বলেছিল, 'পুরুষ মানুষ যদি নিষ্কর্মার মতো বাড়িতে বসে থাকে, সে বুড়িয়ে যাবেই। তোমাকে বুড়ো হয়ে যেতে দেব না। এবার সরকারি গোয়েন্দা হবার বদলে প্রাইভেট গোয়েন্দা হয়ে যাও। পেনশনের সঙ্গে কিছু বাড়তি উপার্জনও তো হবে।'

'আঁখির কথা তো শুনেছ মামু। তোমার কী অভিমত?'

অনুত্তম মামার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

'আমি তো আঁখির সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনেকটা কাজ গুছিয়েও এনেছি। নিজের প্রভাব খাটিয়ে একটা বড় কাগজে ভালো পজিশনে বিজ্ঞাপনও দিয়ে ফেলেছি। তোমার মতামতের তোয়াক্কা আমরা করিনি।' আঁখির দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করলেন মামা। গলায় নিকটজনের প্রত্যয়। বয়স সত্তর পেরিয়েছে। চুলে রং করেন অবশ্য নিয়মিত। অকৃতদার। এক দশক আগে অর্থদপ্তর থেকে অবসর নিয়েছেন। উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও বড় রকমের প্রমোশন বাগাতে পারেননি। অমন কট্টর সৎ ও ধর্মভীরু লোকেরা এযুগে হালে পানি পান না। ওই লোকের নেশা একটাই। দিনের মধ্যে পৃষ্ঠা পাঁচেক লিখতে না পারলে নিজেকে কেমন অপ্রকৃতিস্থ মনে হয়। তবে ওই অবধিই। কয়েক ডজন বই প্রকাশিত হলেও সংশ্লিষ্ট প্রকাশকগণ সমমনস্ক নন— প্রাপ্তির পরিমাণ কথঞ্চিৎ।

এই লেখক মামা আঁখির সঙ্গে সাঁট করে নিখিলবঙ্গের দ্বিতীয় জনপ্রিয়তম পত্রিকার চতুর্থ পৃষ্ঠায় বক্স-বিজ্ঞাপন দিয়েছেন—

৩১ মার্চ, ২০১৬ পশ্চিমবঙ্গের ঝানু সি আই ডি অনুত্তম চৌধুরী চাকুরিস্থল থেকে অবসর নিয়েছেন। বহু বিচিত্র ও কঠিন অপরাধের মূলোচ্ছেদকারী রূপে তাঁর নাম সর্বজনবিদিত। অবসর নেবার পর তিনি কিন্তু কলের পুতুল হয়ে থাকছেন না। প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করেছেন। যোগাযোগের ঠিকানা.....

বড় বিজ্ঞাপন। মামার পকেট হালকা হল। আঁখি টাকা দিতে গিয়ে দাবড়ানি খেয়েছে।

বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর আজ তৃতীয় সকাল। এর মধ্যে কোনো ফোন বাজেনি। কোনো চিরকুটও আসেনি। মামার কপালে ভাঁজ। জানালা দিয়ে একটু তিরতিরে বাতাস ঢুকছে। জানালার তলার দিকটা ঢাকা, ওপরটা খোলা। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টায় মেঘ বাদলার দেখা মেলাটা দুরাশা। যাঁরা নুন-চিনি মেশানো জল ও ছাতা না নিয়ে পথে নামবেন, তাঁরা তাঁদের ভীমরতির সাজা পাবেনই।

হঠাৎই ডোর বেল বেজে ওঠে। বারান্দায় ঝাড়ুটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে এল চৌধুরী পরিবারের সর্বক্ষণের কর্মী জগুদা। গায়ের রং ঝামা কয়লা। গাঁজাখোরের মতন লিকপিকে চেহারা, কপালে দুটো মোটা শিরা আড়াআড়ি, দুই চোখ এমন ঘোরে যে প্রথম দর্শনে তার মতিগতি সম্পর্কে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু অনুত্তম জানে, জগুদার মতন বিশ্বস্ত লোক ভূ-ভারতে বিরল।

জগুদা দরজা খোলে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন এলাকার স্বল্পপরিচিত প্রমোটার শিবকুমার খেমকা। বেঁটে, ঘটাকৃতি ভুঁড়ি, ফরসা, চোখে চশমা, বিরল কেশ, পরনে ছাই রংয়ের সাফারি।

'চৌধুরী সাহেব কী—'

'আছেন। আসুন।'

অতঃপর মিস্টার খেমকাও শামিল এঁদের আলোচনায়। দু-চার কথার পর তাঁর নম্র আবেদন, 'পরশু রোববার। ওই দিন সন্ধ্যায় আমার রাধাকুঞ্জের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। একটা ছোট্ট ঘরোয়া সভার আয়োজন করেছি। আপনাকে সভাপতিত্ব করতে হবে।'

অনুত্তম যেন আচমকাই কালঘুম থেকে জেগে ওঠে, 'আ-মি! অ্যাঁ! আমাকে কেন? ধ্যাৎ মশাই, ঠাকুরের নাম-টাম জপতে পারেন এরকম কোনো মঠের সাধুকে

এনে দাঁড় করান মাইকের সামনে, সবচেয়ে ভালো হয় যদি কোনো সিন্ডিকেটীয় নেতার গলায় গাঁদা ফুলের মালা চড়িয়ে বসিয়ে দিতে পারেন সভাপতির চেয়ারে। ব্যাস, এক ঢিলে দু-পাখি। আপনাকে তো এখনও কত বহুতল গাঁথতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে এখন একমাত্র আবাসন শিল্পেরই যে রকম বাড়বাড়ন্ত, মাপতে বসলে বিস্ময়ে বেহুঁশ হয়ে যাবো।'

অনুত্তমের সাতকাহনেও ভবি ভোলে না। অগত্যা অনুত্তম আঙুল তোলে মামার দিকে, 'ওনাকে বুক করুন। শিখর দত্তগুপ্ত। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, তিয়াত্তর খানা বইয়ের লেখক। আমার মামা।'

বাতাস ঘুরে গেল। খেমকা প্রায় হামলে পড়েন মামার ওপর। মামা বিব্রত। কাল মাঝরাত নাগাদ তাঁর পায়ের গোছে বাতের যে ব্যথা জেগেছিল, সেটা আবার মাথাচাড়া দিতে চাইছে। দিব্যি গল্পগুজব চলছিল এতক্ষণ, কোত্থেকে এ ব্যাটা...। যাকগে, এনিয়ে তো আর অনুত্তমের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করা যায় না। পরবর্তী রহস্য উপন্যাসের প্লট তো একমাত্র অনুত্তমের কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। অতএব, মাতুলবধ সম্পন্ন হল।

নিউটাউনের চিনারপার্ক এখান থেকে এতটাই কাছে যে সিগারেট ফুকলে তার ধোঁয়াটা ওখানে গিয়ে পাক খায়। এই এলাকাতেই আবাসন শিল্পের সবচেয়ে বেশি রমরমা। কারা যে আধ কোটি, এক কোটি টাকা খসিয়ে এক-একখানা ফ্ল্যাটের মালিকানা হাসিল করছেন, ব্রহ্মা জানেন। সবচেয়ে পুরনো কমপ্লেক্সটির অবস্থা দেড় দশকেই রীতিমতন জীর্ণ। প্রবেশপথে ড্রেন উপচে পড়া জল। দুর্গন্ধ। দীর্ঘ তেইশ বছর পুরপ্রধানী করবার পর অতি সম্প্রতি সেই চেয়ারম্যান কোঁচাকাছা খুলে ঢুকে পড়েছেন শাসক দলে। বর্তমানে তাঁকে ঘিরে চাপা হাহাশ্বাস। পথে-ঘাটে এত ভিড় যে লোকের মাথা লোকে খায়। মশকদের বাড়বাড়ন্ত। সংখ্যায় মানুষ ও কুকুর সমান সমান।

ওই এলাকার ক্ষুদ্রতম হাউসিং কমপ্লেক্সটির নাম 'রাধাকুঞ্জ'। এরই প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল। সভাপতিত্ব করলেন অনুত্তমের লেখক মামা। ভাষণ দেবার মুরোদ যে মামার কিছু কম নয়, তার প্রমাণও পাওয়া গেল। বিশেষত তাঁর বক্তব্যের টিকিটি যে বাঁধা থাকে চলমান অর্থনীতির সঙ্গে। ধান ভানতে শিবের গীতও হল কোথাও কোথাও। অনুত্তম এসেছে। আঁখি আসেনি। সে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে গিয়েছে উল্টোডাঙ্গার 'উত্তরায়ণ'-এ তাঁতের শাড়ি কিনতে। ফিরবে হয়তো বিজয়িনীর আনন্দ নিয়ে।

'রাধাকুঞ্জ'-এ মাত্র চারটি ব্লক। ফলে মোট ফ্ল্যাটের সংখ্যা সবে চৌষট্টি। তবে প্রতিটি ফ্ল্যাটই বেশ বড়। আর্কিটেকচারাল কেরামতিতে ভুরু কুঁচকে আগ্রহ করা যাবে না। খেমকা বেশ সময় নিয়ে বানিয়েছেন। সিন্ডিকেটের উৎপাত ক্রমেই বেড়েছে। আগের জমানায় পার্টির নামে টাকা খসাতে আসতেন কেষ্ট-বিষ্টুরা। এ জমানায় জোয়ান মদ্দ বেকার ছেলেরা উল্টো-পাল্টা ইট-বালি-সিমেন্ট নিয়ে একচেটিয়া ব্যবসা চালাচ্ছে। এখানে ওদের নেতা যিনি, তাঁর দাপট প্রবল হলেও চেহারায় কেমন যেন মেয়ে-মেয়ে পেটন।

'রাধাকুঞ্জ'র চৌষট্টিখানা ফ্ল্যাটের মধ্যে গত বারো মাসে বিক্রি হয়েছে মাত্র তেত্রিশটি— ক্রেতাদের সিংহভাগ এন আর আই। পজেশন নিয়েছেন সাকুল্যে আটটি পরিবার। লক্ষণীয়, সেই আট কর্তাই বৃদ্ধ, কর্মক্ষেত্র থেকে অবসরপ্রাপ্ত। আছে বার্ধক্যজনিত রোগ, একজন আবার অথর্ব ও স্মৃতিবিভ্রমে আক্রান্ত।

ফর্মাল সভা শেষ হবার পর অনুত্তম ও মামা সমেত সেই আট গৃহস্বামীকে নিয়ে নিজের প্রকাণ্ড অফিসঘরে জাঁকিয়ে বসলেন শিবকুমার খেমকা। পরপর গদি সাঁটা কোচ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। গোঁসা হবার অবকাশ নেই। ঘুম ঘুম আমেজ আসে। খেমকা বলতে শুরু করে দিলেন, 'আমার রক্তে ব্যবসার বিচি পুঁতে দিয়েছিলেন আমার দাদামশাই। তাঁর ছিল লোহার দোকান বড়বাজারে। সেখানে দেরাজের উপর বসানো থাকতো মস্ত পাথরের লক্ষ্মীমূর্তি। আমি ফিজিক্সের গুড এম এসসি হয়েও চলে এলাম রিয়েল এস্টেটের কারবারে। রেস্ত যে বিস্তর ছিল, তা নয়। ভাগ্যিস ওই মনোরম ব্যক্তিত্বের মানুষ গুপ্তসাহেব আমাকে ব্যাঙ্ক লোন পাইয়ে দিলেন, তাই—'।

খেমকা যাঁর দিকে আঙুল তুললেন, উপস্থিত অনেকের নজর তাঁর ওপর নিবদ্ধ হয়। ছোটখাটো চেহারা, কপালে চন্দনের টিপ, একটু সাধুসজ্জন ভাব, চোখে দামি চশমা,

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E- H - V - GRADE TRANSFORMERS

Power & Distribution Transformers

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

Single Phase Transformers 5 KVA to 25 KVA

Dry Type & Special Type Transformers

Head Office
56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net

Howrah Works:
130, Dharamtolla Road
Salkia, Howrah - 711 107
Phone No. : 2655-5376 / 3093-6492

Jaipur Works :
C-174, Vishwakarma Industrial Area, Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

Agra Works :
Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

পরনের ফুলহাতা শার্টের রংকে মনে হয় বুঝি গ্রিন ব্যানানা, বয়সের গাছ-পাথর খুঁজে পাওয়া দায়, মাথায় অধিকাংশ কেশ লুপ্ত এবং বাকিগুলি দুধসাদা। বিনায়ক গুপ্ত মুচকি হেসে বিনম্র গলায় বললেন, 'আমি ছিলাম হুঁশিয়ার ব্যাঙ্কার। এদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের একজন ডি জি এম। খেমকা যখন লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেন, আমি বুঝেছিলাম, এ লোক প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে পারবে। তাই কিছু নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে ওঁরে লোন মঞ্জুর করি। সেইসঙ্গে নিজেও বুক করলাম একখানা ফ্ল্যাট। ব্যাঙ্ক ঠকেনি, আমিও ঠকিনি।'

খেমকা খেই ধরেন, 'সব ঈশ্বরের কৃপা। আমি কৃষ্ণভক্ত। ত্রিদিববাসীর ভরসা ওই বংশীধারী।'

খেমকার পিছনে দেওয়ালে সাঁটা কাঠের সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। খেমকার সেক্রেটারিয়েট টেবিল থেকে কয়েক কদম দূরত্বে মিশকালো বর্ণের এক বৃদ্ধ। যদিও দেহ সবল, শরীর এমনভাবে এলিয়ে আছে যে তাঁকে স্পষ্টত অথর্ব বলে মনে হয়। তাঁর দিকে চেয়ে খেমকা চোখ নাচান, 'প্রফেসর, অনুষ্ঠান কেমন লাগল?'

তিনি ফ্যালফেলিয়ে তাকান, খানিক বাদে জড়ানো গলায় পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'অনুষ্ঠান! কীসের?'

'এর মধ্যেই ভুলে গেলেন! এ অনর্থ আর ইহজীবনে কাটবার নয়। আমি ধরে ধরে নিয়ে গেলাম। বিলকুল ভুলে গেলেন?'

জানা গেল, নাম তাঁর জগন্নাথ ভক্ত। ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর এম এ। তদুপরি ডক্টরেট। গবেষণার বিষয় ছিল পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের ইতিবৃত্ত এবং স্থাপত্য। খানকয়েক সারগর্ভ গ্রন্থও লিখেছিলেন অধ্যাপনা করার সময়। সেই মানুষ আজ জিনগত ব্যাধিতে সমূলে বিপর্যস্ত ও প্রাণান্তপ্রায়। চলাফেরা করতে পারেন না। স্মৃতিশিখা নিতান্ত টিমটিমে। মেয়ে-জামাই পুনেতে। স্ত্রীর সর্বক্ষণ প্রহরাই ভরসা।

'আমরা এই আট বুড়ো যেন কাপড়ের দোকানের ম্যানিবয়। আমরা এখানে দিব্যি আছি, এটা প্রচার পেলে আরও দশটা বুড়ো এগিয়ে আসবে রাধাকুঞ্জে ফ্ল্যাট কিনতে।'

— যাঁর মুখ দিয়ে এই রসালো কথাগুলি বেরিয়ে এল, সেই বয়স্ক মানুষটি বসে আছেন শিখর দত্তগুপ্তর পাশের আসনটিতে। তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় গোচরে এল। নাম দেবদত্ত কুশারী। ছিলেন সিনিয়র পোস্টমাস্টার। তেজ ছিল ষোলআনা। রিটায়ারমেন্টের বছরখানেক আগে ডিপার্টমেন্টের এক টপ অফিসারের সঙ্গে তর্কাতর্কি প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। ফলে মেয়াদ শেষ হবার আগেই বাধ্যতামূলক অবসর। কুশারী মেনে নেননি। একজন বড় উকিল তাঁর ভাড়াবাড়িতে আসতেন-টাসতেন। তাঁকে দিয়েই সরকারের বিরুদ্ধে মামলা— যা চলেছিল সাত বছর ধরে। বাজি জিতলেন কুশারী। বিস্তর টাকা পেলেন ক্ষতিপূরণ বাবদ। অবিবাহিত লোক নিজের বোধবুদ্ধি খাটিয়ে খেমকার কাছ থেকে একখানা ফ্ল্যাট কিনে একাই রাজত্ব করছেন। মান-অপমানবোধ খুব প্রখর। স্থানীয় পার্টি অফিস থেকে ডোনেশন চাইতে এসে তুলনায় নমনীয় ও খুঁতখুঁতে এক ছোটমাপের নেতা দাবড়ানি খেয়েছেন এবং হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন এই কুশারী লোকটি কী ধাতুতে গড়া।

দেবদত্ত কুশারী সম্পর্কে এমন পরিচিতিটি যিনি সরসভাবে পেশ করলেন, তিনি অসীম সরকার। তাঁর নিজের পরিচিতিটা সত্যিকারের বর্ণময়। তিনি ছিলেন যুগপৎ সন্ধানী সাংবাদিক ও মেধাবী পুরাতত্ত্ববিদ।

অসীমবাবুর বিষয়ে রিটায়ার্ড ব্যাঙ্কার বিনায়ক গুপ্ত সবে বলতে শুরু করেছেন, দপ্ করে নিভে গেল সকল আলো। লোডশেডিং। প্রমোটার খেমকা অবশ্য তাঁর অফিস চালাতে জেনারেটারের ব্যবস্থা রেখেছেন। সেই যন্ত্রে গুঞ্জন ওঠে। ঘর আবার আলোকিত।

গুপ্ত সাহেব বলতে শুরু করেন, 'অসীম আমার পরিচিত গত চার দশক ধরে। 'যুগ নির্দেশ' পত্রিকার সাব এডিটর ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে দারুণভাবে কভার করেছিল। ওর আর একটা পরিচয়, সে যথার্থ পুরাতত্ত্ববিদ। এদেশ ও বিদেশের বহু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ও দেখে এসে তাদের ওপর মূল্যবান নিবন্ধ লিখেছে। শুনেছি, ওর কিছু সংগ্রহও আছে। অবশ্য আমাকে দেখায়নি। খানপাঁচেক বইও তার একসময় প্রকাশিত হয়। তাদের মধ্যে একটা নেহরু পরিবারের মুখে কিঞ্চিৎ চুনকালি মাখায়। আর সেই কারণেই জরুরি অবস্থার সময় অসীম গ্রেপ্তার হয়। রকমারি শারীরিক অত্যাচার চলে হাজতে।

বিনায়ক গুপ্ত বলছেন আর অসীমবাবু মুচকি মুচকি হাসছেন। গুপ্ত থামবার পর অসীমবাবু নিজের সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা যোগ করলেন, 'আমার এখন আয় খুব সামান্য। ফ্রি ল্যান্সিং করে ক'টাকা আর পাই? বউ রত্নময়ী সরকারি কলেজে পড়াতেন। ওর পেনশনটুকুই

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

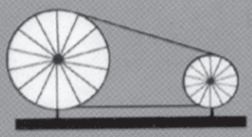

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

ভরসা। টাকা কম। তাই 'সি' ব্লকের মগডালে একটু কম দামের ফ্ল্যাট কিনতে হয়েছে। তাও ইন্সটলমেন্টে। খেমকাজী সুদ নেননি। সদাশয় ব্যক্তি।'

খেমকা হা-হা করে হেসে ওঠেন।

কারোর অনুরোধের অপেক্ষা না রেখেই এবার যিনি নিজের সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন, তিনি বয়সে এদের সমান হলেও দেহকাঠামো বেশ মজবুত, 'আমি সাধন সেনগুপ্ত। চেহারা দেখে হয়তো অনুমান করতে পারছেন, আমি এখনও শরীরচর্চা করে থাকি। আসলে আমি একজন ব্যায়ামশিক্ষক। কলকাতার বুকে দুটো ব্যায়ামাগার চালাই। আমার বউ নীনা সেনগুপ্ত যোগব্যায়াম শেখান। এ থেকেই জগদীশ্বরের কৃপায় আমাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা। দুই ছেলের বিয়ে দিয়েছি। দু'জনই রেলের চাকুরে। একজন থাকে মালদায়, অন্যজন শিলিগুড়িতে। জীবনে রাজনীতি করিনি। রাজনীতি নিয়ে যেখানে পাঁচরকম আলোচনা হয়, আমি তার থেকে অনেক দূরে থাকি।'

সময় অনেকটা গড়াল। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমেছে। অথচ এখনও বেশ তাপ। প্রকৃতি এবছর সকলকে পুড়িয়ে ঝামা করে দেবে। তারপর হয়তো খরার পর আসবে বন্যা মানুষের সহনশক্তিকে দলিত মথিত করতে।

সদাশিব খেমকার সৌজন্যে আর এক রাউন্ড চা এবং দু'প্যাকেট লম্বা সিগারেট এল। পাঁচ ফ্ল্যাট মালিকের পরিচিতি কান পেতে শুনলেন মামা। কাছে কী দূরে, যে ধরনের লোকই হোক না কেন, তিনি মানুষকে নিয়ে চর্চা করতে ভালবাসেন। লেখালেখির জন্য তাঁর যে আসক্তি, তার উৎস মূলত এখানেই।

পরিচিতি বাকি রয়েছে আরও তিনজনের। সুগত পাল, সমীর বসু এবং ডাক্তার আতাউল্লা মণ্ডল। সুগত পালের লোহালক্কড়ের দোকান ভি আই পি রোডের ওপর কৈখালিতে। তিনি নিউটাউনেও ফ্ল্যাট কিনেছেন। কিন্তু থাকতে চান রাধাকুঞ্জে। সমীর বসু একজন জবরদস্ত জমির দালাল। আগে ছিলেন বামপন্থায়। বর্তমানে তাঁর একমাত্র

বাহুবলী পুত্রটির নিরন্তর উস্কানিতে শাসকদলের পতাকা হাতে নিয়েছেন। স্ত্রীর মাথায় এখনও আধহাত ঘোমটা। সমীর বসুর জায়গাজমি সবই বর্ধমানের গাংপুরে। জমি থেকে মোটা আয়। সপ্তাহে এখানে দু'দিনের বেশি থাকেন না। বাকি পাঁচদিন বর্ধমানের নতুনপল্লীতে— যেখানে তাঁর ভরভরন্ত সংসার।

আর ওই আতাউল্লা মণ্ডল— একমুখ সাদা দাড়ি, মাথায় ফেজ। পাশকরা হোমিওপ্যাথ। কুড়ি টাকার ফি বাড়তে বাড়তে এখন সত্তর। সচরাচর নম্র, বিনীত, মিষ্টভাষী। কিন্তু পরিস্থিতিভেদে তাঁর যে বৃষজাতীয় আচরণও বেরিয়ে আসতে পারে, তার সবুদ নারায়ণপুরের লোকেরা দু-একবার পেয়েছে। স্ত্রী ছিমনি বিবি বাম আমলে কাউন্সিলর ছিলেন। অন্তঃস্রোতা লোভ ও ভয়ে সম্প্রতি ডিগবাজি খেয়ে শাসকদলে শামিল হয়েছেন। প্রতিদিন ভোরে বুড়োবুড়ি এক লোটা করে দুধ খান ও খুব ছোটাছুটি করেন। খেমকা ফ্ল্যাটের যে দর হেঁকেছিলেন, তা নিয়ে বারগেনিং করেননি। একলপ্তে সব টাকা টেবিলের ওপর রেখেছেন। ছেলে বাইক দাপিয়ে ছোটাছুটি করে। উল্টোডাঙ্গায় ফলের দোকান। মেয়ের শাদি হয়েছে রাজাবাজারে আর এক ফল ব্যবসায়ীর সঙ্গে।

এই শেষ তিনজনের বৃত্তান্ত শোনা গেল খেমকাজীরই মুখ থেকে। মামা শুনতে শুনতে চোখ বন্ধ করেছেন। কী ভাবছেন? আট বুড়োকে নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখবেন? কিন্তু এখানে রহস্য কোথায়? তিনি যে আদতে রহস্যকাহিনির লেখক।

খবরের কাগজ যদি আরশি হয়, তাহলে সেখানে চোখ বোলালে নির্ঘাৎ হৃৎকম্প হবে। তিনটে খুন, দুটো রেপ, কোনো পার্টি সমর্থকের বাড়িতে আগুন, মুড়িমুড়কির মতন বোমাবৃষ্টি এবং একটা সন্দেহজনক পথদুর্ঘটনা। সামনে ভোট। ঠা-ঠা রোদ্দুরে নেতা-নেত্রীদের পথপরিক্রমা। বঙ্কিমের ভাষায়— '... নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ করে কামনা।...' ভাগ্যিস, মানুষের স্মৃতিতে এই তাপ ও আস্ফালন বেশি দিন থাকবে না।

অনুত্তমের লেখক মামা তাম্বুল চর্বণ করতে করতে ইত্যাকার প্রবহমাণ চালচিত্রকে নিয়ে একটি রম্যরচনা সদ্য সমাপ্ত করেছেন। আজই সেটাকে পোস্ট করতে চান একটি জনপ্রিয় পত্রিকায়। নির্ঘাৎ ছাপা হবে। কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও মিলবে। রহস্যকাহিনি লেখার ফাঁকে ফাঁকে এজাতীয় লেখা চালিয়ে যেতে পারলে মুন্সিয়ানা বাড়ে। হাতে কিছু টাকা এলে বাউন্ডুলে মন ঠেলে নিয়ে যায় কাছেপিঠে কোথাও। তখন সঙ্গে যদি অনুত্তম ও আঁখি থাকে, আনন্দের পরিমাণ বাড়ে।

বেশ কিছুদিন যাবৎ অনুত্তম ও আঁখির সঙ্গে যোগাযোগ নেই। অনুত্তমের ডিটেকটিভ এজেন্সি আজ অবধি একটাও কেস পায়নি। আসলে মানুষের মন থেকে আস্থা বা নির্ভরতার ব্যাপারটাই ক্রমশ উবে যাচ্ছে। অদ্ভুত এক নির্বোধ পরিস্থিতি। কখন যে বিনা কারণে গলায় কাঁটা বিঁধে যাবে, কেউ বলতে পারবে না। আর মাসচারেক বাদে বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব। নয়-নয় করে দুটো উপন্যাস এবং গোটা সাতেক ছোট-বড় গল্প তাঁকে নামাতেই হবে কিছু সংখ্যক পছন্দের পত্রিকার শারদ সংখ্যাকে পুষ্ট করতে।

কিন্তু মশলা কোথায়? বেশি বানিয়ে বানিয়ে লেখা ধাতে সয় না। মামার তাই অস্থিরতা বাড়ছে। শেষে আর থাকতে না পেরে মোবাইলের বোতাম টিপে ভাগ্নে অনুত্তমকে পাকড়ান।

'ভাগ্নে।'

'বলো, মামা।'

'কোনো কেস-টেস এল?'

'এক্কেবারে না।'

'অতবড় বিজ্ঞাপনটা দিলাম। সব কিছুতেই ডুগডুগি বাজছে যে।'

'আমি কিন্তু ধৈর্য হারাইনি।'

'কোনো কেস এলে আমাকে কিন্তু জানাবে।'

'আলবত। খাটো গলায় নয়, জোর গলায়।'

মামাকে আশ্বস্ত করে মোবাইলটা নামিয়ে রাখবার মিনিট তিনেকের মধ্যে সেটা আবার পল রবসনের গান শোনাতে শুরু করে। অনুত্তম ওটাকে কানের ওপর চেপে ধরে।

ফোন করেছেন শিবকুমার খেমকা। গলার আওয়াজ শুনলে মনে হবে যেন বুকে তাঁর শেল বিঁধেছে।

'খবর কী, খেমকাজী?'

'... মার্ডার! রাধাকুঞ্জে খুন!... হেনস্থার একশেষ!'

‘বলেন কী!’

‘আমার স্বপ্নের প্রজেক্ট। মধ্যবিত্তের সাধের ডেরা...’

‘শুরুতেই রক্তপাত! খুনির কী জ্ঞানগম্যিও থাকতে নেই?’

খেমকা কী কাঁদছেন? নাকের জলে চোখের জলে বুজে আসছে গলা।

আঁখি এসে দাঁড়িয়েছে পাশটিতে। অনুত্তম বলে, ‘কারোর প্রীত্যর্থে নয়, সদুদ্দেশ্যে তৈরি আমাদের এজেন্সি। তার প্রথম কেসটা চলে এল।’

আঁখির দুই চোখে ঝিলিক, ‘খুলে বলবে একটু?’

‘তাহলে বসতে হবে দু’দণ্ড। নিজের ইন্দ্রিয়শক্তিকেও ধারালো করতে হবে।’

আঁখি অনুত্তম মুখোমুখি।

অনুত্তম বলে, ‘মনে আছে, ক’দিন আগে প্রমোটার শিবকুমার খেমকা এসেছিলেন?’

‘বিলক্ষণ।’

‘এটাও নিশ্চয় মনে আছে, খেমকার সাধের প্রজেক্ট রাধাকুঞ্জর প্রথম বার্ষিকী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করতে গেলেন আমাদের লেখক মামা? সঙ্গে আমিও ছিলাম।’

‘ভুলিনি। আমি যাইনি।’

‘রাইট। তুমি সেদিন অন্য একটি কর্মে নিয়মানুবর্তী।’

‘আর কথা না বাড়িয়ে আসল ব্যাপারটা জানাও।’

‘গিয়ে সেদিন দেখলাম, রাধাকুঞ্জে রয়েছে মাত্র আটটি পরিবার। আটটি পরিবারের আটজন বৃদ্ধ কর্তা। এক একজনের জীবনযুদ্ধ এক এক পরিধিতে। কাউকেই খুব বড় সফল না বলা গেলেও একজনও কিন্তু ঠিক সেই অর্থে নতিস্বীকারও করেননি।’

‘বলে যাও—।’

‘আটজনের মধ্যে একজনকে বাদ দিলে বাকি সাতজনই যেন ক্রিজে সেঁটে থাকা রাহুল দ্রাবিড়। চট্ করে ভুল শট খেলে আউট হবার পাত্র নন।

কাহিল অবস্থা কেবল একজনের। তিনিও কর্মজীবনে ছিলেন একজন সফল অধ্যাপক, গবেষক। এখন প্রায় অথর্ব, থেকে থেকে স্মৃতিভ্রষ্ট হন।’

আঁখির স্বরে তীক্ষ্ণতা, ‘সেই অথর্ব মানুষটিই কী খুন হলেন?’

‘না, খুন যিনি হয়েছেন, তিনি ছিলেন একজন সাহসী সাংবাদিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ। বেশ সরস ও সজীব। নাম অসীম সরকার।’

‘ওই নামের সঙ্গে আমিও পরিচিত। ক’দিন আগে কাগজে তাঁর একটা রম্যরচনাও পড়েছি। নাম ‘ভোট ও পুরাতত্ত্ব’।’

‘মামাকে খবর দিচ্ছি। তুমিও কী যাবে?’

‘এখন নয়।’

নিতম্ব ঘুরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল আঁখি। শব্দ শুনে মনে হয়, জগুদা বাসনপত্রে সাবান মাখাচ্ছে।

ডাক পেতেই মামা হাজির। আবার মামার কথায় আঁখিও তার সিদ্ধান্ত বদলেছে। এবার সেও চলল রাধাকুঞ্জে। প্রকৃতির মতি রীতিমতন হিংস্র। বেখাপ্পা রকমের তাপপ্রবাহ— কলকাতায় বিয়াল্লিশ ডিগ্রি! সকলে বিচলিত। ভোটের সঙ্গে এই উত্তাপের কী কোনো নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে? একাধিক মানুষ সহ্য না করতে পেরে মূর্চ্ছা গিয়েছেন। মৃতের সংখ্যা, সরকারি পরিসংখ্যানে এ অবধি দুই। রাজনীতির কুশীলবরা যদি ভোট চাইতে গিয়ে বাড়িতে বাড়িতে দু-চার গণ্ডুষ শীতল বারি ছিটিয়ে আসতে পারতেন, ভোটারদের হৃদয়ে অনুকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারত।

অনুত্তম আগেই খেমকাকে জানিয়ে দিয়েছে। তার নিজস্ব গাড়ি নেই। কোনোকালেই ছিল না। বরাবর সরকারি গাড়িতে চেপে ছুটেছে একটার পর একটা রহস্যঘন কুয়াশার জাল ছিন্ন করতে। ফলে ক্লায়েন্ট শিবকুমার খেমকা নিজের ছোট্ট ন্যানোখানাকেই পাঠিয়েছেন। বিস্কুট কালার। খানিক নিষ্পলকে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকেন মামা। ভেতরে তিনজনের খুব ঠাসাঠাসি অবস্থা। বাতাসে রমণীয় কর্পূর ও ধূপের গন্ধ। দরজা বন্ধ করার শব্দে সম্বিৎ আসে ড্রাইভারের। গাড়ি চলতে শুরু করে।

হাউসিং কমপ্লেক্সে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে আছেন খেমকা। বিরস বদন। ঠোঁটের কোণে সেই বাণিজ্যিক হাসিটি নেই। দু-চোখে বিপন্নতার ছায়া। স্বর কাষ্ঠবৎ, ‘আপনি না আসা অবধি খুব অস্থির অস্থির লাগছিল।’

ন্যানো থেকে প্রথমে নামলেন মামা, তারপর আঁখি,

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ঃ—

KALA SANGAM

Kolkata

তারপর গোয়েন্দা অনুত্তম চৌধুরী। এই সমস্ত কেসে শুরুতেই কী রকম ব্যস্ততা ও নিবিষ্ট চিত্ততা দেখাতে হয়, সেটা অনুত্তমের ষোলআনা রপ্ত। সেই ভিনি-ভিসি-ভিডি। এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। রাধাকুঞ্জের চারদিকটা নতুন করে জরিপ করে যেন। থমথমে পরিস্থিতি। উড়ে আসা শালিক-জোড়াকেও কেমন বুঝি বিমর্ষ ও কাবু দেখাচ্ছে।

অনুত্তম খেমকাকে বলল, 'খেমকাজী, প্রথমেই আপনাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, আমি কিন্তু আর পুলিশ গোয়েন্দা নই। আমি এখন একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা। দু'জনের ক্ষমতা, কাজের ধারা, তদারকি করা— সবই আলাদা। কাজ শুরু করবার আগে তাই আমি আপনার মুখ থেকে মূল বৃত্তান্তটা শুনে নিতে চাই। তারপর কাজে হাত দেব।'

'তাহলে আগে আমার অফিস ঘরে চলুন।'

'চলুন।'

সেই প্রশস্ত অফিসঘর। আজও চেয়ারগুলি সাজানো রয়েছে গায়ে গায়ে। খেমকা চা আনালেন। সঙ্গে মামুলি বিস্কুট। অনুত্তম বলেন, 'যে কোনো খুনের পিছনে কতগুলি অবধারিত কারণ থাকে। এমনকী যে হত্যার পিছনে রাজনীতি ও তজ্জনিত রোয়াব দোসর হয়, সেখানেও কিছু না কিছু রহস্যের ছোঁয়া থাকে। আপনার সঙ্গে ফোনে বিস্তারিত কথা হয়নি। কিন্তু যেহেতু আপনি আমাকে নিযুক্ত করতে চাইছেন খুনের কারণ ও খুনিকে খুঁজে বের করতে, আপনি আপনার জানা তথ্যগুলি আমাকে জানান।'

খেমকা রুমাল দিয়ে কপাল মোছেন। ধীরে ধীরে বলতে থাকেন, 'আমি শঙ্কিত এই কারণে যে অসীম সরকার খুন হওয়ায় রাধাকুঞ্জের গায়ে কালির ছিটে লাগল। এটা আমার ব্যবসায়িক ক্ষতি। তাই অসীমবাবুর খুনি আমারও শত্রু। আমি তার শাস্তি চাই।

অসীম সরকারকে এনেছিলেন ব্যাঙ্ক অফিসার বিনায়ক গুপ্ত। বড় সাংবাদিক ছিলেন। আবার ঝানু প্রত্নতত্ত্ববিদও। তাঁর স্ত্রী রত্নময়ী দেবী একসময়ে সরকারি কলেজে পড়াতেন। অসীমবাবু অজাতশত্রু ছিলেন না। জরুরি অবস্থার সময় লেখালেখির অপরাধে জেলও খেটেছেন। বলেছিলেন, আমার পয়সা কম। তাই চারতলার ফ্ল্যাট যদি কিছু কম দামে দেন, নিতে রাজি আছি। 'সি' ব্লকে চারতলার ফ্ল্যাটটা তদনুযায়ী আমি তাঁকে বিক্রি করি। বিক্রি করার আগে অসীমবাবুর অনুরোধে আমি ফ্ল্যাটটিতে মামুলি কিছু কাজও করে দেই। মোটামুটি বিখ্যাত মানুষ। তার ওপর গুপ্ত সাহেবের অনুরোধ। তাই—।

অসীমবাবু স্থানীয় লোকদের সঙ্গে তেমন মেলামেশা করতেন না। লেখালেখি নিয়েই থাকতেন। কিন্তু স্ত্রী রত্নময়ীদেবী খুব মিশুকে। এই কমপ্লেক্সে যতজন মহিলা আছেন, সকলের সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্য। একটু সময় সাশ্রয় করতে পারলেই এর বাড়ি তার বাড়ি চক্কর কাটেন। অন্যরাও সানন্দে সরকার বউদিকে কাছে টেনে নেন।'

খেমকা ক্ষণিকের বিরতি নিলেন। মামার দৃষ্টিতে মুগ্ধতা। আবাল্য বাঙালিদের মধ্যে থাকবার কারণে ভদ্রলোক যেরকম মুন্সিয়ানার সঙ্গে বাংলা বলতে পারছেন, তা অকুণ্ঠিত প্রশংসা দাবি করতে পারে।

'অসীমবাবু যে সন্ধ্যায় খুন হন'— খেমকা আবার বলতে শুরু করলেন, 'রত্নময়ী সরকার সেই সন্ধ্যাতেই গিয়েছিলেন গ্রাউন্ডফ্লোরের বাসিন্দা জগন্নাথ ভক্তের ফ্ল্যাটে। অথর্ব কানে খাটো, স্মৃতিভ্রষ্ট ভক্তবাবুর স্ত্রী নিশাদেবীই তাঁকে আসতে বলেছিলেন। দুই প্রৌঢ়া এরপর একসঙ্গে বেরিয়ে যান বটতলা বাজারে টুকিটাকি কিছু কিনতে। ফিরে আসেন এক ঘণ্টার মধ্যে। আর সেই এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই খুন হলেন অসীম সরকার। রত্নময়ীদেবী দেখলেন, দরজা ভেজানো, ঠেলতেই নজরে এল সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে মিস্টার সরকারের। মাথাটা ফেটে চৌচির। টাটকা রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা ফ্লোর।'

খেমকা থামলেন। চোখ বুজলেন।

অনুত্তম প্রশ্ন করলেন, 'তারপর কী হল?'

'রত্নময়ীদেবীর চিৎকার। দারোয়ান জিৎবাহাদুর ছুটে যায়। খবর পেয়ে একে একে সবাই গিয়ে হাজির হলাম। থানায় খবর দিলাম। পুলিশ এল। কেস ডায়েরি লেখা হল। বডি তুলে নিয়ে গেল পোস্টমর্টেমের জন্য। তিনজন সাংবাদিকও এলেন। তাঁরা অসীমবাবুর পূর্বপরিচিত। অনেক ছবি তোলা হল। খবরটা আজকের কাগজে স্থান পায়নি। হয়তো কাল এককোণে বের হবে। আমার কপাল পুড়ল। 'রাধাকুঞ্জ' আর বাড়তে সাহস পাবে না। পুলিশের ওপর ভরসা করে বসে থাকতে চাই না। তাই আপনাকে দিতে চাইছি কেসটা। আপনার প্রাপ্য আমি মেটাব।'

অনুত্তম বলল, 'পুলিশের ওপর আস্থা হারাবেন না। সপ্তাহ কয়েক আগে আমিও পুলিশ ছিলাম।'

'আপনার কথা একেবারেই আলাদা। এরকম দুর্দ্ধর্ষ গোয়েন্দা—'

‘এখনও অনেকে আছেন। কাজে লাগাবার সদিচ্ছা থাকতে হবে। ভালো কথা, কোন থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল?’

‘এয়ারপোর্ট থানা।’

‘তার মানে মিঃ হরিসাধন বল যেখানকার অফিসার-ইন-চার্জ।’

‘বলসাহেব নিজে এসেছিলেন।’

‘খুব ভালো। শুনেও বুকে বল পেলাম। আমার সঙ্গে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা। ... যাক, চলুন, মিস্টার বিনায়ক গুপ্তের সঙ্গে কথা বলতে চাই।’

‘খুনের স্পটে যাবেন না?’

‘সেটা তো এখন বাসি হয়ে গেছে। আরও কিছু পরে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।’

অনুত্তমরা তিনজনই শিবকুমার খেমকার অনুগামী হল।

বিনায়ক গুপ্তর ফ্ল্যাট ‘বি’ ব্লকের দোতলায়। ব্যাঙ্কের বড় অফিসার ছিলেন। দেয়াল আলমারিতে তাই জ্বলজ্বল করছে Book of Banking Instructions। আবার নিচের তাকে পুরনো বসুমতী ও রিডার্স ডাইজেস্টও রয়েছে। টেবিলের ওপর খোলা অবস্থায় দাবার বোর্ড। গজ-ঘোড়ার চাল অসমাপ্ত।

অনুত্তমের প্রশ্নের উত্তরে গুপ্ত ভাঙা গলায় বললেন, ‘আমি কেবল হতভম্ব নই, মনে হল যেন পাঁজরের একখানা হাড় দু'টুকরো হয়েছে। রাধাকুঞ্জ ছিল স্বর্গ। মুহূর্তে হয়ে গেল নরক। অসীমের সঙ্গে আমার পরিচয় কত কালের! আমিই তো ওকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম।’

‘এনেছিলেন কেন?’

‘ভালো প্রতিবেশী পাবার আশায়। তাছাড়া শিবকুমার খেমকা প্রমোটার হিসেবে অবশ্যই অন্যরকম। লোভের বশে কনস্ট্রাকশনে ফাঁকি দেননি। পোস্তার ব্রিজের মতো হঠাৎ ভেঙে পড়বে না।’

‘জানলাম, অসীমবাবু খুন হয়েছেন ভর সন্ধ্যায়। এব্যাপারে আপনার কী অভিমত?’

গুপ্তর মুখ আরও থমথমে। ওয়াল-ক্লকটার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলতে থাকেন, ‘আমি আর কী অভিমত দেব! আপনি বিখ্যাত গোয়েন্দা। কত ঘনীভূত রহস্যকে ফিকে করে ছেড়েছেন কর্মজীবনে। আমার কেবল একটাই খটকা— খুন হল সন্ধেবেলা। তখনও যেন খুব গরম আর লু। দু-একজন হয়তো জ্বালা জুড়াতে পায়চারি করছেন কমপ্লেক্সের মধ্যে। অসীমের বউ ডক্টর ভক্তের বউকে নিয়ে সবে গিয়েছে বটতলা বাজারে। অসীম ঘরে একা। এসময়ে বাইরের কোনো লোকের পক্ষে কি সম্ভব দারোয়ান বাহাদুরের নজর এড়িয়ে চারতলায় উঠে অসীমের ফ্ল্যাটে ঢুকে তার মাথাটাকে ফাটিয়ে চৌচির করে দেওয়া? যদিও ‘সি’ ব্লকে থাকেন মোটে দুটো পরিবার— একেবারে মগডালে অসীম আর গ্রাউন্ড ফ্লোরে এক অথর্ব বুড়ো ডক্টর ভক্ত। তবুও হাতে একটা অস্ত্র নিয়ে চারতলায় উঠে একজন মানুষকে খুন করে সকলের নজর এড়িয়ে চলে যাওয়াটা তো চাট্টিখানি কথা নয়।’

অনুত্তম ভুরু কুঁচকে বলল, ‘আপনার পর্যবেক্ষণী শক্তি দেখছি একজন দুঁদে গোয়েন্দার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।’

গুপ্তর মুখে ম্লান হাসি, ‘দুঁদে গোয়েন্দা না হতে পারি, দুঁদে ব্যাঙ্কার তো ছিলাম। সম্ভাব্য ক্লায়েন্টদের চরিত্র চিনতে হত, কে ধুরন্ধর ঠগবাজ ছ্যাকড়া গাড়ি, আর কে বাধা-বিপত্তি উজিয়ে হতে পারেন সৎ ও সফল পক্ষীরাজ।’

অনুত্তম মাথা নাড়ে, ‘আরও একটা বিষয় মনে রাখতে হবে। আততায়ী কলিংবেল টিপেছিল। অপরিচিত লোক হলে অসীমবাবু কি হুট করে কপাট খুলতেন?’

‘রাইট, রাইট। এখানে প্রতিটি ফ্ল্যাটের প্রবেশদ্বারে ‘আই হোল’ লাগিয়েছেন খেমকা।’

এতক্ষণ চুপচাপ অনুত্তম ও বিনায়ক গুপ্তের প্রশ্নোত্তর শোনার পর এবার মুখ খুললেন অনুত্তমের লেখক মামা, ‘অসীম সরকারকে কিন্তু আমার বেশ শক্তপোক্ত চেহারার মানুষ বলে মনে হয়েছে। তাঁকে মাথা ফাটিয়ে শেষ করতে পারল যে লোক, সে যে হাড়ে-মজ্জায় মেদে কতবড় বলশালী, সেটা— ভেবে দেখা দরকার।’

‘চমৎকার! অন্তত রাধাকুঞ্জের প্রতিটি লোকের দেহ-কাঠামো ও সম্ভাব্য শক্তিকে জুত করে মাপা দরকার। তাই না?’— অনুত্তম প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় খেমকার মুখের দিকে তাকিয়ে।

খেমকা চমকে ওঠেন। তাঁর মুখ থেকে যেন হঠাৎই

বেরিয়ে এল, ‘সাধন সেনগুপ্ত। ব্যায়ামবীর।’

অনুত্তম চিবুক চুলকায়, ‘বাজিয়ে দেখতেই হবে। তার আগে জিৎ বাহাদুরের সঙ্গে কথা বলা দরকার।’

প্যাকেটের ওপর সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে মামা বললেন, ‘দারোয়ান হিসেবে নেপালিরা আদর্শ। খেমকাজীও একজন বাহাদুর পুষেছেন।’

খেমকা বললেন, ‘দারোয়ান একজন নয়, দু-জন। জিৎ বাহাদুর নেপালি, রাম পাশোয়ান বিহারি।’

যে সময়সীমার মধ্যে অসীম সরকার খুন হন, কমপ্লেক্সের মূল প্রবেশদ্বারে ছিল জিৎ বাহাদুর। রাধাকুঞ্জে ঢোকার পথ ওই একটাই। তিনদিকে সাত ফুট প্রাচীর। প্রাচীরে তীক্ষ্ণ মোটা পেরেক পোঁতা আছে। আর একদিকে পুকুর। পুকুরের একাংশ অবশ্য শুকিয়ে খাঁ-খাঁ। অন্য অংশে এখনও যা জল, সাঁতরে আসতে হবে। যে কোণ ধরেই আসুক না কেন, রাধাকুঞ্জে ঢুকতে যে কোনো লোকের কালঘাম ছুটে যাবে এবং কারোর না কারোর নজরে তার ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা আশি থেকে নব্বই শতাংশ। কিন্তু জিৎ বাহাদুর বুক ঠুকে জানিয়ে দিলে, ওই সময়ে একটি অপরিচিত মাছিও তার নজরদারি এড়িয়ে রাধাকুঞ্জে ঢোকেনি। রাধাকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কেবলমাত্র দুই মহিলা— অসীম সরকারের স্ত্রী রত্নময়ী সরকার এবং ড. ভক্তের গৃহিণী নিশাদেবী। দু-জনে কথা বলতে বলতে বের হলেন। পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন মিনিটের মধ্যে ফিরেও আসেন। তার পাঁচ-সাত মিনিট পর শোনা যায় রত্নময়ী দেবীর আর্তনাদ।

Todi Honda, 225C, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700 020
Contact Info: 9831447735 / 9007035185, e-mail : todihonda@gmail.com

এতক্ষণে মুখ খুলল আঁখি, 'তার মানে এখানকার আটজন বৃদ্ধের মধ্যে যে কোনো একজন অসীম সরকারের খুনি।'

অনুত্তম বলল, 'এবং সেই খুনি যথেষ্ট বলবান।'

খেমকা বললেন, 'ড. জগন্নাথ ভক্তকে অবশ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়া চলে। অথর্ব মানুষ, কানে কম শোনেন, কোনো কিছু মাথায় ধরে রাখতে পারেন না।'

মামা বললেন, 'অতএব আমরা এখন রাধাকুঞ্জের সবচেয়ে বলবান বৃদ্ধটির নিকট যাব।'

খেমকার উচ্চারণ, 'বডি বিল্ডার সাধন সেনগুপ্ত।'

ঝম্ ঝম্ শব্দ শুরু হল। জল তোলার পাম্প চালু হয়েছে। জলের লেয়ার কত হাত নেমে গিয়েছে, অনুমানের বিষয়। এরপর হয়তো পাম্পের পাইপ আর জলের নাগাল পাবে না। সন্ধ্যারাতেও বহতা বাতাসে ছ্যাঁকা দেবার ক্ষমতা। বিশ-বাইশ বছরের মধ্যে এরকম গরম আসেনি।

সাধন সেনগুপ্তর খোঁজ নিতে গিয়ে হতাশ হতে হল। তিনি তাঁর ছয়জন বাছাই-করা ছাত্রকে নিয়ে কটক গিয়েছেন তিনদিন আগে। সেখানে এক সর্বভারতীয় দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনের আসর বসেছে। একটা-দুটো পুরস্কার নিয়ে মি. সেনগুপ্ত নিশ্চয় ফিরবেন আর দিন দুয়েকের মধ্যে। অর্থাৎ রাধাকুঞ্জের সম্ভাব্য বলবান বৃদ্ধ খুনিরূপে সাধন সেনগুপ্তকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনা গেল না।

খেমকার মুখের দিকে চেয়ে অনুত্তম বলল, 'আপনাদের হোমিওপ্যাথ ডা. আতাউল্লা মণ্ডলের কাছে যাওয়া যাক।'

খেমকা একটু বিব্রত, 'মণ্ডল তো এখন তাঁর চেম্বারে গিয়ে বসেছেন।'

'আমরা তাঁর চেম্বারেই যাব।' অনুত্তম বলল।

চেম্বার দূরে নয়। রাস্তা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেই জায়গাটার নাম মণিখোলা। গুটিকয়েক সাদামাটা দোকান। ভাজাভুজির দোকানেই যা একটু ভিড়। পোড়াতেলে ভাজা চপ বেগুনির প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ বাঙালির স্বাভাবিক প্রবণতা। এলাকায় রাজনীতি নিয়ে চর্চা হয় খুব, কিন্তু সবাই যেন কেমন ভাববাদী, আজ অবধি রাজনীতিকে কেন্দ্র করে মারামারি খুনোখুনি হয়নি। হয়তো সে কারণেই এখানে ভোটের মুখেও, বড় দূরের কথা, মধ্যমমানের বচনপটু একজন নেতারও টিকিটি অবধি দেখা যায়নি।

ডা. আতাউল্লা মণ্ডলের চেম্বার এখানেই। একটা আটপৌরে বাড়ির দোতলায়। খুব সরু খাড়া সিঁড়ি। ওঠা-নামার সময় বয়স্কদের দুর্ভাবনা অধিকার করে নেয়— যে কোনো মুহূর্তে অসতর্ক হলেই পা ফস্কাতে পারে। মাথার ওপর ঢালু ছাদ। গুমোট ভাব। আতাউল্লা দিব্যি ঘাপটি মেরে বসে আছেন। দু-জন রোগীকে বিদেয় দেবার পর আর কেউ নেই। ঘরে স্পিরিটের গন্ধ।

চারজনকে একসঙ্গে বসতে দেবার চেয়ার না থাকায় খেমকাকে বসতে হল একটা টুলে।

অনুত্তম শুরু করে, 'আমি এসেছি মি. সরকারের খুনের ব্যাপারে বেসরকারি স্তরে অনুসন্ধান করতে। খেমকাজী আমাকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন।'

'বুঝেছি।'

'দুটো ব্যাপার স্পষ্ট। প্রথম, খুনটা হয়েছে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত আটটার মধ্যে। দ্বিতীয়ত, খুনি বহিরাগত নয়। সে রাধাকুঞ্জের কম্পাউন্ডের মধ্যেই ছিল বা থাকে।'

'আমার কাছে কী জানতে চান?'

'সেদিন ওই সময়ে আপনি কোথায় ছিলেন?'

'এখন আপনার ঘড়িতে কটা?'

'সন্ধ্যা সাতটা পনেরো।'

'আমি প্রতিদিন সকালে ন'টায় এবং বিকেলে পৌনে সাতটায় চেম্বার খুলে বসি। সেদিনও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আমি রাত দশটার আগে সচরাচর চেম্বার বন্ধ করি না। সুতরাং আপনি যে সময়ের কথা বলছেন, তখন আমি এখানে রোগী দেখছি। কাকে দেখছি, জানেন? তিনি দেবদত্ত কুশারী। রাধাকুঞ্জেরই ফ্ল্যাটওনার। অম্বলে ভোগেন। বন্ধু লোক। প্রায় একটি ঘণ্টা কাটিয়ে যান আমার এখানে। দরকার মনে করলে কুশারীকে গিয়ে ক্রশ করতে পারেন।'

একজন বোরখাপরা মহিলা উঠেছেন তাঁর রুগ্ন বাচ্চাটিকে নিয়ে। অনুত্তমরা উঠে দাঁড়ায়।

'আর কেবল একটি প্রশ্ন— দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে অনুত্তম— 'অসীম সরকার মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন, অন্তত আপনার বিচারে?'

আতাউল্লার স্বর খাদে নামে, 'মৃত মানুষের নিন্দে করা আর কারোর ফেলে যাওয়া ভুক্তাবশেষে খিদে মেটানো, একই ব্যাপার বলে মনে করি। তবুও বলি, উনি সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশতেন না। আমার প্রতি তাঁর প্রসন্নতা কম থাকবার কারণ একটাই— আমার বিবি ছিমনির দলত্যাগ। আগের দল ছেড়ে শাসকদলের শিবিরে ঢুকে

যাওয়া। এই নিয়ে এখানে ওখানে কটাক্ষ করেছেন। আমার কানে এসেছে। আমি গা করিনি। আমার বউ করলেও আমি কিন্তু রাজনীতির পোকা নই। রাজনীতি আমার কাছে এখন আর নীতির রাজা নয়, আবার যথার্থ রাজার নীতিও নয়। এই বাংলায় গত ঊনচল্লিশ বছরে সব নীতি-ফীতি পচেগলে দুর্গন্ধময় হয়ে উঠেছে।

আরও একটা কথা, স্যার, অসীম সরকারের সঙ্গে আমার দূরত্ব থাকলেও তাঁর স্ত্রী রত্নময়ীদেবীর কিন্তু তুলনা হয় না। খুব মিশুকে খুব সামাজিক। আমার স্ত্রী ছিমনি বিবিও মিসেস সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

আবার সেই কসরত করে লোহার রেলিং ধরে ধরে নিচে নামা। খেমকা জানতে চান, 'এবার কি দেবদত্ত কুশারী?'

অনুত্তম বলল, 'নো। দেবদত্তকে তালিকার বাইরে সরিয়ে দিতে আপত্তি নেই। বরং চলুন একবার সুগত পালের কাছে।'

'তিনি তো এখন তাঁর লোহা-লক্কড়ের দোকানে।'

'দোকানটা কোথায়?'

'কৈখালিতে।'

'আমরা সেখানেই যাব।'

আবার সেই ছোট্ট ন্যানো। ঠাসাঠাসি। তবুও তো জ্যাম কমাতে ড্রাইভারকে নামিয়ে দিয়ে শিবকুমার খেমকা স্বয়ং স্টিয়ারিং ধরেছেন।

নারায়ণপুরের বটতলা মোড়ে থিকথিকে মানুষ, রিক্সা, বাস, ঠেলা, ট্যাক্সি, প্রাইভেটকার ইত্যাদির এমন জটলা যে নতুন কেউ এলে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ হবেই। দু-জন সিভিক পুলিশ চৌকিদারি করতে গিয়ে গলদঘর্ম। শেষমেষ তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালেন ভোট সামলাতে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনীর তিনজন জওয়ান। ভাগ্যিস এখানে বড়সড় রাজনৈতিক সভাটভা বিশেষ হয় না। বোমাবাজি খুনখারাপি বিরল হওয়ায় রাজনৈতিক বড়কর্তারাও ঢুঁ মারেন কালেভদ্রে। প্রচুর ছোট ছোট দোকান, ব্যস্ত আছেন পাতি ব্যবসায়ীরা। ওরই মাঝে তিন-তিনটে বিরিয়ানির দোকান। গন্ধে বাতাস ম-ম।

খেমকা ভিড় কাটালেন ধৈর্য সহকারে। তারপর সাড়ে তিন কিলোমিটার পথ যেন কয়েক নিমেষে পার হয়ে গেল ন্যানো। কইখালির মোড়ে দোকান। বড় সাইনবোর্ড। লাল-নীল হরফে লেখা 'পাল হার্ডওয়্যারস'। দোকানের সামনে সদাব্যস্ত ভি আই পি রোড। ক্রেতাদের সংখ্যা কম হলেও দোকানের হাল যে খারাপ নয়, বোঝা যায়। যাঁরা আসেন, তাঁদের কেনাকাটার পরিমাণ কম নয়। গদিতে বসে আছেন সুগত পাল। গায়ের রং কালো, মাথায় টাক, শরীরের মধ্যদেশে প্রভূত চর্বি, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, ক্রমাগত বসে থাকার দরুন বয়সানুপাতে বার্ধক্যের প্রভাব বেশি। দোকানে আছে দুই ছোকরা কর্মচারীও। মামা, খেমকা ও আঁখির আপত্তি সত্ত্বেও এক ছোকরাকে পাঠিয়ে ভাঁড়ের চা ও সুগার-ফ্রি বিস্কিট আনালেন। খেমকার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অকপটে বলছি, কেবল নিউটাউনে নয়, আমার আরও দুটো বাসস্থান কেনা আছে। একটা সন্তোষপুরে, অন্যটা মধ্যমগ্রামে। কিন্তু আমার ভারী ভালো লাগত নারায়ণপুরের রাধাকুঞ্জের ফ্ল্যাটে থাকতে। 'এ' ব্লকের সেকেন্ড ফ্লোর। হু-হু বাতাস। হইহুল্লোড় নেই বললেই চলে। গত এক বছরে দিব্যি ধাতস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ ওই খুন। ভাবলে শিউরে উঠি। আমার স্ত্রীর অনুযোগ এর মধ্যেই একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। আমাদের কয়েকদিনের ভেতর রাধাকুঞ্জ ছাড়তে হবে। চেষ্টা করব ফ্ল্যাটটা বেচে দিতে।'

সুগত পালের কথায় খেমকার কপালে ভাঁজ পড়ল। তাঁর চোখ-মুখ আরও ফ্যাকাসে হয়ে আসে। পালের মুরোদ আছে। একাধিক বাসস্থানের মালিক। ওঁর পক্ষে এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ। সবচেয়ে ক্ষতি হয়ে গেল খেমকার। রাধাকুঞ্জের অবশিষ্ট ফ্ল্যাটগুলির ক্রেতা কি তাহলে পাওয়া যাবে না?

অনুত্তম প্রশ্ন করে, 'কাল রাত সাড়ে সাতটা থেকে আটটার সময় কোথায় ছিলেন?'

সুগত পাল ঠোঁট ওল্টান, 'কোথায় আবার? এই দোকানে। কর্মচারীরা আমার ভালো, বিশ্বস্ত। তবুও ক্যাশ বাক্সটা আমাকেই আগলাতে হয়। সকাল ন'টায় দোকান খুলি। বেলা দুটোয় বন্ধ করতে হয়। আবার খুলি বিকেল সাড়ে চারটায়। খোলা থাকে রাত সাড়ে ন'টা অবধি। রবিবার ছুটি। থানা থেকে বড়বাবু এসেছিলেন। তাঁরও ছিল

এই একই প্রশ্ন। আমারও এই একই উত্তর। তখন অবশ্য আমার দুই কর্মচারীকেও সাক্ষী দিতে হয়েছে।'

'আমার কিন্তু আরও একটি প্রশ্ন আছে— যেখানে আপনার খোলা মনের সহযোগিতা চাই।'

'বলুন। আমি খোলা মনে কোঅপারেট করব।'

'অসীম সরকারের প্রতিবেশী হয়ে আছেন গত এক বছর ধরে। মানুষটাকে আপনার কেমন মনে হত?'

পালের মুখে অসহায়তার হাসি, 'ধুস, এ আমি আর কী বলব? ওঁর দুনিয়ার সঙ্গে আমার দুনিয়ার মিল একরত্তিও ছিল না। উনি ছিলেন নামি ও সাহসী সাংবাদিক। নেহরু পরিবারকে ঠুকেছিলেন বলে জরুরি অবস্থার সময় জেল খেটেছেন। আবার প্রত্নতত্ত্ববিশারদও। শুনেছি ওঁর সংগ্রহে নাকি কিছু অতীতকালের মুদ্রাও রয়েছে। এই বিষয়ে খুব ন্যাক অভিনেতা বসন্ত চৌধুরীরও। আমার জানার সুযোগ হয়েছিল। ওই পুরাতত্ত্বের টানেই দেশে-বিদেশে ঘুরেছেন অসীম সরকার। জলের মতো টাকা খরচ হয়েছে। লাভ কতটুকু হয়েছে, সন্দেহ। এই নিয়ে তার স্ত্রীর বেশ আক্ষেপ।

অসীমবাবু মেলামেশা করতেন মানুষ বেছে বেছে। যাঁদের খুব বোলচাল কিংবা ঘ্যানঘ্যানানি, তাঁদের এড়িয়ে যেতেন। যাঁদের পড়াশুনা কম, তাঁদের পাত্তা দিতেন না। আমার সঙ্গে ছিল কেবল হাই-হ্যালোর সম্পর্ক। এটা কতদূর সুলক্ষণ, আপনারাই বিচার করবেন।'

'তাহলে রাধাকুঞ্জে কাদের সঙ্গে অসীমবাবুর মেলামেশা বেশি ছিল?'

'আমি যতটা দেখেছি, ওখানে দু-জনের সঙ্গে অসীমবাবু একটু বেশি মিশতেন। একজন তো হলেন তাঁর অনেক দিনের পরিচিত বিনায়ক গুপ্ত। আর দ্বিতীয়জন জগন্নাথ ভক্ত।'

'জগন্নাথ ভক্ত! আরে তিনি তো ঠিক ঠিক চলাফেরাই করতে পারেন না। কানে কম শোনেন। কিছুই মনে রাখতে পারেন না। এরকম লোক—'

'কী জানি, কেন। শুনেছি, অনেক দিনের পরিচয়। ভুললে তো চলবে না, জগন্নাথ ভক্ত এক সময় নামকরা অধ্যাপক ছিলেন। বেশ কয়েকখানা বই, নোটবুকের লেখক। সেই সময়ে হয়তো খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। পুরনো সম্পর্কটাকে পুরোপুরি ভুলতে পারেননি। তাছাড়া অসীমবাবুর স্ত্রী রত্নময়ীদেবী হলেন জগন্নাথ ভক্তর মিসেস নিশা দেবীর বিশেষ বান্ধবী। এটাও দুটো পরিবারকে কাছাকাছি আসতে সাহায্য করেছে।'

এই অবধি বলে পাল কিছুটা বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। আবছা স্বরে বললেন, 'অসীমবাবু খুন হবার তিনদিন আগে বেলা তিনটে নাগাদ একজন সাহেব ঢুকেছিলেন রাধাকুঞ্জে।'

অনুত্তম নড়েচড়ে বসে, 'সাহেব!'

'হ্যাঁ। পাক্কা সাহেব। চামড়ার রং সাদা, চুল সোনালি, চোখ নীল, লম্বায় ছয় ফুট তো হবেই। মাঝবয়সী। পেটানো শরীর। আমি তখন দোকান বন্ধ করে এসেছি দুপুরে খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম করতে। দারোয়ানের খাতায় দেখলাম, নাম তাঁর অ্যান্টনি ফিশার। দেখা করতে এসেছেন জগন্নাথ ভক্তের সঙ্গে। গাড়িতে চেপে আসেননি। এসেছেন অটোর সওয়ারি হয়ে। ভরদুপুর। দৈবাৎ আমার নজরে এসে যান। আমার মনে হল, জগন্নাথ ভক্তও তো একসময় নামি লোক ছিলেন। সেই সময়ে কত ধরনের শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে পরিচয় ছিল। ইনি হয়তো তাঁদেরই একজন।'

'হতেই পারে। সাহেব হয়তো অথর্ব জগন্নাথ ভক্তকে ছুঁয়ে চারতলায় চলে যান অসীম সরকারের কাছে।'

পাল মাথা নাড়ান, 'না, অসীম সরকারের ফ্ল্যাটে সাহেব যাননি। কারণ আমার স্ত্রী রত্নময়ীদেবীকে ঘটনাটা জানাতে তিনি বিস্মিত হন। তাঁদের ফ্ল্যাটে কোনো ভিনদেশির পদার্পণ ঘটেনি।'

সুগত পালের দোকান থেকে যখন বের হন তারা, তখন রাত আটটা চল্লিশ।

খেমকা প্রশ্ন করেন, 'আজ কি আর কাউকে প্রশ্ন করতে চান?'

অনুত্তম সোৎসাহে বলল, 'নিশ্চয়। যত রাতই হোক, জিজ্ঞাসাবাদের পর্বটা আজই শেষ করতে চাই। চলুন, সমীর বসুকে গিয়ে পাকড়াই।'

খেমকা অবাক হলেও মামা ও আঁখি নির্বিকার। অনুত্তমকে তারা চেনে। যে অবধি সত্যের নাগাল না পাচ্ছে, সে তার জালকে সামনে ছড়াবে। সময় অসময়ের তোয়াক্কা করবে না। তারপর একসময় জালে যখন আসল মালটি ঢুকে পড়বে, চটপট গুটিয়ে আনবে সেই জাল।

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও
অভিনন্দন :—

ANU
SAREES

গাড়িতে ঠাসাঠাসি অবশ্যম্ভাবী। তার মধ্যেও অনুত্তম কেমন একটু উদাস বা অন্যমনস্ক। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে সুপরিচিত বিবেকবাণী, 'সত্যের জন্য সব কিছুকেই ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোনো কিছুরই জন্য সত্যকে বর্জন করা চলে না। সত্যের অনুসন্ধান মানে শক্তির প্রকাশ— এটা দুর্বল বা অন্ধের মতো হাতড়ানো নয়।'

সমীর বসুর ফ্ল্যাট 'বি' ব্লকের তিনতলায়। বসু বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর ব্যস্ততা অন্য আবাসিকদের তুলনায় এককাঠি বেশি। খালি গায়ে লুঙ্গি হাঁটুর ওপর গুটিয়ে স্বয়ং গাদাখানেক তরকারি কাটতে বসে গিয়েছেন— একটা ঢাউস গামলায় কেটে-ছুলে রাখছেন পটল, ঝিঙে, কাঁকরোল, কুমড়ো এবং উচ্ছে। বোঝা যায়, ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর কতটা সমব্যথী। ডোরবেল বাজতে দরজা খুললেন বোস গিন্নি। ছুটে গিয়েছিলেন বিরক্তিতে রণমূর্তি ধারণ করে। তবে দরজার ওপিঠে খেমকাকে দেখে খানিক কুঁকড়েও গেলেন। যদিও বয়স অনেক, শাড়ির জেল্লা লক্ষণীয়। মুখময় বলিরেখার কাটাকুটি থাকা সত্ত্বেও ঘাড়ের দুপাশ দিয়ে সামনে এসেছে সাচ্চা ও নকল চুলের মিশেলে গড়া বিনুনি। অথচ মাঝে মাঝেই ঘোমটাকে বড় করেন টেনে।

আবার একপ্রস্ত চা সেবন। প্রশ্নোত্তরে অংশ নিলেন সমীরবাবুর স্ত্রীও। বরং বেশিটা বললেন, তিনিই, 'আমাদের আদি বাড়ি চট্টগ্রামে। থাকতে পারিনি মুসলমানদের ভয়ে। এখানে যখন এলাম—'

স্ত্রীকে থামিয়ে সমীরবাবু বলতে শুরু করলেন, 'সম্বল ছিল মাত্র হাজার পনেরো টাকা। ওই নিয়েই জমির দালালিতে নেমে পড়লাম। ছেলেটা তখন নেহাৎ শিশু। এখানে তখন জলের দরে জমি পাওয়া যেত। পঞ্চাশ-ষাট টাকা কাঠা। তিন বিঘে জমি। সাড়ে তিন হাজার টাকায় প্রথম লপ্তেই কিনে ফেললাম। জমির কিছুটা জলা। পরে সেই জমিই খেমকাসাহেবকে বেচেছি ষোল লাখ টাকায়।'

অনুত্তমের ঠোঁটে বাঁকা হাসি, 'খরচও তো আছে। মস্তান বিদায়। পার্টির খাই মেটানো।'

'খুব-খুব। ব্যালান্স রাখা কষ্ট। যখন শুরু করেছিলাম, তখন ছিল কংগ্রেসী আমল। তখনও ফেস করতে হয়েছে ধমক, শাসানি, গালিগালাজ ও কথায় কথায় হাত পাতা। বাধ্য হয়ে তেরঙা ঝাণ্ডার তলায় গিয়ে দাঁড়াই। তারপর এল লম্বা বাম আমল। খাঁই তাদেরও খুব। সামনে কৌটাবাজি। পেছনে চওড়া হাত। বাধ্য হয়ে ধরলাম লাল পতাকা। ওদের প্রত্যেকটা বড় বড় মিটিংয়ে গিয়েছি ভিড় বাড়াতে। কোন নেতা কী বলছেন, কানে ঢুকলেও মনে ঢুকত না।'

সমীরবাবুর যেন বলতে বলতে হাঁফ ধরে গেছে। জলের গেলাস খুঁজছেন। সুযোগ বুঝে খেই ধরলেন, মিসেস বসু, 'তারপর এই সময়। আমার ছেলে বাবুল। বড় হয়েছে। বিয়ে করতে চায় না। ওর চেয়ে বিষয়টা ভালো বোঝে। ক্লাবের সেক্রেটারি হয়ে গেল। ব্যাস, আর কী ভাবনা? ফুর্তিটুর্তিও চলছে। আবার ইনকামও। এ তল্লাটে যত বিল্ডিং ম্যাটিরিয়ালের দরকার, তা কিনতে হয় বাবুল ও তার চার বন্ধুর কাছ থেকে। বর্ধমানেও ধানি জমি করেছি। অভাব আর নেই। উনি তো প্রায়ই বর্ধমান যান।'

'বাবুলকে দেখছি না তো!' অনুত্তম বলে।

'দেখবেন কী করে? আর পাঁচদিন বাদে ভোট। বাবুলকে পাঠানো হয়েছে কাকদ্বীপে। এ সময়ে পার্টির কাজ না করলে চলে? আজ এক সপ্তাহের ওপর ওখানে রয়েছে। ফোনে কথা হয়।'

অনুত্তম তাকায় সমীর বসুর মুখের দিকে, 'এবার আসল কথায় আসা যাক। অসীম সরকার খুন হলেন। মাথা ফেটে চৌচির। প্রতিবেশী হিসেবে আপনার কী অভিমত?'

প্রশ্ন শুনে সমীর বসু যেন হতভম্ব— 'আমার অভিমত? আমি কী বলব? এ একটা সাংঘাতিক কেলেঙ্কারি। যদিও এক বছর ধরে একই কম্পাউন্ডে বসবাস করছি, উনি আমাকে কতটুকু চিনতেন বা আমিই তাঁকে কতটুকু জানি? আঁতেল লোক। আমার মতন জমির দালালের সঙ্গে মিশবেনই বা কেন?'

অনুত্তম হাল্কা হাসি হাসে, 'তাহলে মিশতেন কার সঙ্গে অসীমবাবু? মানুষ তো আসলে একটি সামাজিক জীব।'

উত্তর এল, 'মিশতেন গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে। আর দেখা যেত জগন্নাথ ভক্তের ফ্ল্যাটে ঢুকতে। জগন্নাথবাবুও তো শুনেছি বিদ্যের জাহাজ। এখন প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়লেও বিদ্যে তো নষ্ট হয় না।'

মামা কয়েকবার মাথা হেলান। দু-বার উচ্চারণ করেন, 'খুব দামি কথা বললেন বোসবাবু। বিদ্যে কখনও নষ্ট হয়

না।'

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে আচমকা ঘুরে তাকায় অনুত্তম, সমীরবাবুকে প্রশ্ন করে, 'অসীম সরকার যেদিন খুন হন, সেদিন একজন সাহেব ঢুকেছিল রাধাকুঞ্জে। আপনি তাকে দেখেছেন?'

সমীর বসু অবাক, 'সাহেব! না তো।'

কিন্তু ঠিক তখনই সমীরবাবুর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা মিসেস বোস বলে ওঠেন, 'আমি দেখেছি। নিশাদি সাহেবকে ডেকে নিয়ে তাদের ঘরে ঢোকালেন।'

'ধন্যবাদ।'

খেমকা হয়তো ভেবেছিলেন, অনুত্তম জগন্নাথ ভক্তর ডেরায় আর ঢুঁ মারতে যাবে না। কিন্তু কোত্থেকে এক সাহেবের প্রসঙ্গ এসে যাওয়ায় এবার হয়তো ওই প্রায় পঙ্গু, প্রায় বধির এবং নিতান্ত দুর্বল স্মৃতির অধিকারী মানুষটার ফ্ল্যাটেও গিয়ে ঢুকতে হবে সদলবলে। তাতে যে অনেক অনেক সময় গলে যাবে, সেটাও অবশ্যম্ভাবী।

রাত তো প্রায় দশটা। কথার পিঠে কথা আর কথা। শুনতে শুনতে প্রমোটারের গা ঝিমঝিম করছে। মাথাটাও যেন আর ঠিক মতন কাজ করছে না। ভেবেছিলেন, ভক্তর একতলা ফ্ল্যাটে এবার ঢুকতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, অনুত্তম চলেছে ঊর্ধমুখে। সেই অভিশপ্ত চারতলা ফ্ল্যাট— যেখানে গত সন্ধ্যা-রাতে প্রাক্তন সাংবাদিক পুরাতত্ত্ববিদ অসীম সরকার খুন হয়েছিলেন। খেমকা আগেই খবর পাঠিয়েছিলেন। তাই রত্নময়ীদেবী নিশ্চয় ঘরে রয়েছেন। ওরকম বিকট বিপর্যয় ঘটে যাবার পর তাঁকে প্রায় সর্বক্ষণ সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছেন জগন্নাথ ভক্তর স্ত্রী নিশা দেবী।

চারজনেরই বয়স যথেষ্ট। একতলা থেকে চারতলা অবধি সিঁড়ি টপকানো কম-বেশি কষ্টকর। এ যেন একটা অবস্থা থেকে আর একটা অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া। সিঁড়ির তিন বাঁকের প্রথম দুটোতে ছোট টিউব লাইট। পরিষ্কার আলো। কিন্তু শেষ বাঁকে যেখানে অসীম সরকারের ফ্ল্যাট, একটা কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে এবং সেখানে আলোও হলদেটে। উঠতে উঠতে খেমকা শোনালেন, 'অসীমবাবুর নামডাক যতই থাক, টাকা পয়সার টানাটানি চলছিল। প্রাচীন প্রত্নরত্ন, মুদ্রা এই সমস্ত খুঁজতে গিয়ে অকাতরে টাকা খরচ করেছেন একটা সময়। নানান দিকে দেনা। অথচ কী মানসিকতা দেখুন, সংগৃহীত একটি জিনিসও বেচবেন না, হাতছাড়া করবেন না। কয়েকটা চোরাবাজারে ছাড়লেই কিন্তু পেতে পারেন লাখ লাখ টাকা।'

অনুত্তমের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, 'আপনাকে বলেছিলেন তিনি এই কথা?'

'হ্যাঁ। হিসেব মতো এখনও আমি দেড় লাখ টাকা পাই। একরকম নিঃখরচায় তাঁকে আমি একটা চোরকুঠরিও করে দিয়েছি বড় বেডরুম সংলগ্ন বাথরুমটাতে। সেখানে নাকি তিনি তাঁর কিছু প্রত্নরত্ন লুকিয়ে রাখবেন।'

'আরেব্বাস! এ কথা এখানকার আর কে কে জানেন?'

'কেউ না। আমাকে দিয়ে যেহেতু কুঠুরিটা করাতে হয়েছে, এ তথ্য যেন কারোর গোচরে না যায়। এখন মনে হল, আপনাকে জানানো খুব দরকার।'

'মিস্টার গুপ্ত এবং মি: ভক্তও জানেন না?'

'অসীমবাবু রাধাকৃষ্ণের মূর্তি ছুঁয়ে বলেছিলেন, দুনিয়ায় মাত্র তিনজন তাঁর চোরাকুঠুরি সম্পর্কে অবগত। প্রথমজন অসীমবাবু, দ্বিতীয়জন রত্নময়ী সরকার এবং শেষজন হল এই অধম শিবকুমার খেমকা।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কথাগুলি বলছেন খেমকা। হাঁফ ধরে যাচ্ছে তাঁর। একবার রেলিং ধরে টাল সামলালেন। সিঁড়ির শেষপর্যায়ে মাথার ওপর পায়রার বাসা। পায়রার ময়লা পড়েছে। আঁখি তার ছোট রুমালখানা নাকে চেপে ধরে।

ডোরবেল বাজল।

কপাট খুলতে জায়গাটা ভেসে গেল জোরালো আলোয়। দরজা খুলেছেন রত্নময়ী সরকার নন। খুললেন জগন্নাথ ভক্তর স্ত্রী নিশা ভক্ত। রত্নময়ী শুয়েছিলেন বড় ঘরে। উঠে এলেন। ভীষণ রকম বিধ্বস্ত ও কাতর। দাঁতে দাঁত চেপে উদ্যত কান্নাকে চেপে রাখছেন।

খেমকা রত্নময়ীকে বললেন, 'পুলিশের ওপর সবটা ছেড়ে না দিয়ে একজন প্রাইভেট গোয়েন্দাকেও নিয়োগ করলাম খুনিকে বের করতে। ইনিই সেই বিখ্যাত মানুষ অনুত্তম চৌধুরী। একমাস আগেও ছিলেন সরকারি গোয়েন্দা। রিটায়ার করার পর নিজে এজেন্সি খুলে বসেছেন। আমিই ওনার প্রথম ক্লায়েন্ট।

আর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি— ইনি হলেন আঁখি

চৌধুরী। অনুত্তম চৌধুরীর সহধর্মিণী। আর উনি হলেন মিস্টার চৌধুরীর মামা শিখর দত্তগুপ্ত। সাহিত্যিক।'

রত্নময়ীদেবী সকলকে বসতে অনুরোধ করলেন। ভাঙা গলায় বললেন, 'অনুত্তম চৌধুরীর নাম আমি একাধিকবার শুনেছি। অনেক জটিল কেসের আসামিকে পাকড়েছেন। আর মিস্টার দত্তগুপ্তরও একখানা গোয়েন্দা গল্পের বই আমি পড়েছি। উনি জীবিত থাকলে জমিয়ে গল্প করতেন।'

দু-হাতে মুখ ঢেকে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছেন রত্নময়ী। আঁখি উঠে গিয়ে তাঁর পাশে বসে। পিঠে হাত বোলায়।

মিসেস নিশা ভক্ত কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন অনুত্তমের মুখের দিকে। বোঝা যায়, তিনিও ওর নাম ও খ্যাতির সঙ্গে পরিচিত। তিনি উঠে দাঁড়ান। রত্নময়ীকে বলেন, 'তুমি এনাদের সঙ্গে কথা বল, আমি নীচে যাচ্ছি। অনেকক্ষণ উনি একা বসে আছেন।'

অনুত্তম নিশাদেবীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমরা কিন্তু আপনাদের সঙ্গেও কথা বলতে যাচ্ছি।'

মিসেস ভক্ত থমকে দাঁড়ান, 'উনি অত রাত অবধি জেগে থাকতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

'আপনি চেষ্টা করবেন তাঁকে জাগিয়ে রাখার।'

'কিন্তু উনি তো কথা—।'

'আমি মনে হয় মি: ভক্তকে কথা বলাতে পারব।'

অনুত্তমের গলায় অদ্ভুত দৃঢ়তা।

নিশাদেবী ত্বরিতে নামতে থাকেন। অনুত্তমের দৃষ্টি ঘোরে এ ঘরের এ কোণ থেকে সে কোণ অবধি। দূরে একটা টুলের ওপর কোণাভাঙা ফুলদানি। ওর ভেতরকার সমস্ত ফুল বাসি ও বিবর্ণ। বড় পরিসরের ঘর। কিন্তু পরিচ্ছন্নতার অভাব পীড়াদায়ক। দুই দিকে মস্ত দেওয়াল আলমারি ঠাসা কেবল বই আর খাতা। একজন বিদ্বান ও একজন বিদ্যাবতী নারী যখন ঘর বাঁধেন, তখন হয়তো তাঁদের ঘরের পরিস্থিতি এরকমই দাঁড়ায়। ঘরের কোণে কোণে সিলিংয়েও মাকড়সার জাল। আর রয়েছে যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেকগুলি বাঁধানো ছবি। তাদের একটিতে দেখা যাচ্ছে, মধ্যযৌবনের অসীম সরকার আর তাঁর সুন্দরী স্ত্রী রত্নময়ী সরকার দিল্লির প্রাকৃতিক মিউজিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দু-জনের মাঝে রয়েছে একটি ফুটফুটে বালক।

অনুত্তম প্রশ্ন করে, 'আপনাদের সন্তান? সে কোথায়?'

রত্নময়ীর গলার স্বরকে যেন কেমন তীক্ষ্ণ শোনায়, 'আমাদের একমাত্র ছেলে। ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানী। কিন্তু বড় স্বার্থপর। প্রেম করে বিয়ে করল এক আবগারি দপ্তরের ঘুষখোরের চতুর মেয়েকে। বিয়ে করার তিন মাসের মধ্যে গুটি গুটি স্বামীকে নিয়ে সেই মেয়ে সেই যে সম্পর্ক ছিন্ন করল, আজ অবধি একবার খোঁজও নেয় না।'

অনুত্তম দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলে, 'খবর দিয়েছেন ছেলেকে?'

'দিয়েছি। কবে আসবে, আদৌ আসবে কি না, জানি না। শুধু বলেছি, তোর বাবা নেই। বৃথালাপে লাভ কী?'

অনুত্তম অন্য ছবিগুলির দিকে মন দেয়। এ ক'টিতে দেখা গেল, অসীম সরকারের দিকে লাঠি উঁচিয়ে রয়েছেন এক পুলিশ অফিসার। পুলিশের ভ্যানে তোলার আগের ছবি। সম্ভবত সেই জরুরি অবস্থার সময়— নেহরু পরিবার সম্পর্কে কিছু বিপজ্জনক তথ্য লেখার অপরাধে অসীম সরকার গ্রেপ্তারবরণ করছেন। মুখে কোনো ভয়-ভীতির ছাপ নেই, বরং যেন এক প্রীতিকর অনুভব, এই রকমই মনে হচ্ছে সেই মুহূর্তের অসীমকে। যে সাংবাদিক ক্যামেরাবদ্ধ করে রেখেছেন মুহূর্তটিকে, তাঁরও সাহস ও মুন্সিয়ানাকে সাধুবাদ দিতে হয়। আর একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, অসীম সরকার দাঁড়িয়ে আছেন মিশরের অতিকায় এক পিরামিডের সামনে। এখানে তিনি পুরাতত্ত্বের সন্ধানী।

এরপর রয়েছে আরও তিনখানা বাঁধানো ছবি। সেইগুলি যেন কোনো ঐহিক ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিরূপ নয়। দুর্লভ টেরাকোটার একঝাঁক মূর্তি। একখানা মধ্যযুগীয় মুদ্রা। সবশেষে এমন একটি ছবি— যার দিকে তাকালে শরীর-মন কেমন যেন অবশ হয়ে আসে। এমনকী সদা সচেতন অনুত্তমেরও ভেতরটা ঝিমঝিম করে ওঠে। কিছুক্ষণ তো মাথায় ঢুকছে না, কার ছবি এটা। নির্ঘাত একটা ধাক্কা খেল অনুত্তম। সম্ভবত ইনি কালী। কিন্তু কংকাল। কংকাল, অথচ হাড়গুলি যেন কুয়াশামাখা। স্পষ্ট, খুব স্পষ্ট কিন্তু শিরা উপশিরাগুলি। অনুত্তমের মাথা থেকে অন্য সব সাত-পাঁচ ভাবনাগুলি মুছে যাচ্ছে। সে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এক অপ্রাকৃত শুনশান পটভূমিতে।

একসময় তার গলা থেকে বেরিয়ে আসে, 'এ ছবিটা কার? কীসের?'

রত্নময়ীর কাছ থেকে উত্তর এল, 'ওঁর উদ্ধারকরা এক অসাধারণ শিল্পনিদর্শন। উনি বলেছিলেন, ওই কংকালেশ্বরীর মূর্তি নাকি সমুদ্রগুপ্তর আমলের। বর্ধমানে

DUTA
SPICE POWDER & PAPAD
থাকে যদি ডাটা জমে যায় রান্নাটা
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
TURMERIC POWDER
CUMIN POWDER
CORIANDER POWDER
RED CHILLI POWDER
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
Regd. Office : 207, Maharshi Debendra Road, Kolkata - 700007
Contact : (M) 98366-72200 / (033) 2259-1796/5548
Email : dutaspice@gmail.com | Website : www.dutaspices.com

দামোদরের চরে পেয়েছিলেন। তখন ওঁর সঙ্গে একাজে হাত মিলিয়েছিলেন নীচুতলার ড. জগন্নাথ ভক্ত। উনি তখন বর্ধমান রাজকলেজে হিস্ট্রির হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। আর আমি পড়াই বর্ধমানের মহারানি কলেজে। তখন থেকে নিশার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব।'

অনুত্তম ধীরে ধীরে চেয়ারে গিয়ে বসে। রত্নময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চায়, 'কংকালেশ্বরীর মূর্তিটি এখন কোথায়?'

খানিক চুপচাপ থাকার পর রত্নময়ী বললেন, 'সেটা এই বাড়িতেই আছে। চোরকুঠুরিতে, দেখবেন?'

'দেখব। তবে একেবারে শেষ অঙ্কে। এই রাধাকুঞ্জের কোনো লোক কী সেই চোরকুঠুরির সন্ধান জানেন?'

'জানেন একমাত্র ওই খেমকাজী। উনিই তো সেটা তৈরি করে দিয়েছিলেন আমার স্বামীর অনুরোধে। শর্ত ছিল, তিনি কারোর কাছে গল্পচ্ছলেও ফাঁস করবেন না।'

খেমকা বললেন, 'আমি আমার কথা রেখেছি ম্যাডাম। এই মাত্র মিনিট পনেরো আগে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মিস্টার চৌধুরীকে এ ব্যাপারে অবহিত করি। কারণ, আমার মনে হল, এই সময়ে তদন্তকারী গোয়েন্দাকে এটাও জানানো দরকার।'

অনুত্তম সহজ আর সাবলীলভাব ফিরে পায়। হঠাৎই সে রত্নময়ীকে প্রশ্ন করে বসে, 'অ্যান্টনি ফিশার কত টাকা দাম দেবার লোভ দেখিয়েছিলেন ওই কংকালেশ্বরীর মূর্তির জন্য?'

রত্নময়ীদেবী যে খুব বড় মাপের ধাক্কা খেলেন এই প্রশ্নে বোঝা গেল। তাঁর মুখ থেকে যেন সমস্ত রক্ত কে শুষে নিল! পরক্ষণে অবসাদে ডুবে যাবার গলায় বললেন, 'আপনি ফিশারকে চেনেন?'

অনুত্তমের দু'চোখে তখনও কৌতূহল। 'মিসেস সরকার, ভুলে যাবেন না আমি একমাস আগেও সি আই ডি-তে ছিলাম।

প্রচুর রেকর্ড আমাদের ঘাঁটতে হত নিরিবিলিতে। অপরাধীকে পাকড়াতে কত ধ্যাড়ধেড়ে এলাকার এপাশ-ওপাশ চষে বেড়িয়েছি। এখন যিনি অ্যান্টনি ফিশার, তিনিই হয়তো একসময়ে ছিলেন জোশেফ পিটারসন। কত রকমের রাখঢাক বজায় রেখে কাজে নামতে হয় প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুর চোরাকারবারিদের। মেঠো লোকদের মতো ভুল করলে কি তাদের চলে?'

রত্নময়ী ধুঁকতে ধুঁকতে বললেন, 'ষোল লাখ টাকার অফার ছিল ওঁর কাছে।'

'কংকালেশ্বরীর হদিশ ফিশার পেল কোন সূত্রে?'

'ড. জগন্নাথ ভক্ত। আগেই বলেছি, মূর্তিটা দামোদরের চর থেকে তুলে আনতে ডক্টর ভক্ত ওঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।'

'তার মানে জগন্নাথ ভক্ত যতটা অসুস্থ দেখান নিজেকে, আসলে তিনি তা নন।'

'একথা আমি বলতে পারব না। দেখি তো চুপচাপ চোখ বুজে ইজি চেয়ারে দেহ এলিয়ে থাকেন। কারোর সঙ্গে কথা বলেন না। কেউ বললে হয় তা শোনেন না, বা বোঝেন না।'

'অথচ একজন চোরাচালানিকে এনে হাজির করলেন রাধাকুঞ্জে! বাঃ! যাক, অসীমবাবু নিশ্চয় ফিশারের প্রস্তাবে রাজি হননি?'

'রাজি তো মরে গেলেও হতেন না। বরং খুব রেগে গিয়েছিলেন ডক্টর ভক্তের ওপর। তখনই নীচে নামতে চেয়েছিলেন। আমি অনেক বুঝিয়ে ওঁকে শান্ত করি।'

অনুত্তমের মুখে আবার কাঠিন্য ফিরে আসে, 'এবার বলুন, গত সন্ধ্যায় আপনার কী মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল?'

রত্নময়ীর চোখের কোণে জলের ফোঁটা। উঠে গিয়ে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকলেন। তারপর যথাসাধ্য স্বাভাবিক গলায় বলতে থাকেন, 'আমরা দু-জনে ছিলাম ভারত সেবাশ্রমের আশ্রিত। ওঁর ওই পুরাতত্ত্ব নেশাহেতু মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় হলেও আমরা সুখী দম্পতি ছিলাম। একমাত্র ছেলে পর হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মানুষের সঙ্গে অন্তত আমি পারতপক্ষে কখনও পীড়াদায়ক ব্যবহার করতাম না। শ্রেয়কে বরণীয় করেছি। নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখাবার চেষ্টা না করলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজেদের মতন করে প্রতিবাদ করেছি। মিথ্যাচারীর চেয়ে খাঁটি মানুষদের বেশি কদর করেছি।

গত সন্ধ্যাতেও আমরা দু-জন একসঙ্গে প্রার্থনায় বসেছিলাম। বলেছি, হে মা করুণাময়ী, তোমার করুণায় অন্ধরা দেখতে পায়, খঞ্জরা চলতে পারে, বধিররা শুনতে পায়। তোমার নিকট আমাদের এই প্রাত্যহিক প্রণাম জ্ঞাপনে যেন কভু বিঘ্ন না ঘটে।

কিন্তু বিঘ্ন ঘটল। সন্ধ্যা সাতটার কিছু পরে নীচ থেকে এলেন নিশাদি। আমাদের দু-জনের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে। যেমন আমার স্বামীর সঙ্গেও ভক্তদার পরিচয় অনেক দিনের। একসঙ্গে অতীত যুগের নিদর্শন খুঁজেছেন এখানে-ওখানে। নিশাদি যাবেন বটতলা বাজারে। ওখানকার গোপাল ভট্টাচার্য ক্লথ হাউস-এ শাড়ি কিনবেন। অন্য দোকানে কিনবেন দু-একটা কসমেটিক্সও। আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। আমরা এরকম একসঙ্গে মার্কেটিং করে থাকি। ভালো লাগে।

রাধাকুঞ্জ থেকে বের হবার মুখে বাধা। একদল বাইক-পাগল তরুণ চলতে চলতে থেমে পড়েছে আমাদের কম্পাউন্ডের সামনে। বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের গুচ্ছের পতাকা গুঁজে যাবে এখানকার প্রতিটি ফ্ল্যাটের জানালা বা অন্য কোনো ফাঁকফোকরে। ভোট তো একেবারে চলে এসেছে। তাই এই তৎপরতা। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে আপত্তি করে? আমরা বয়স্কা মহিলা হয়েও সাবধানী। কিছু বলতে গেলে কোনোরকম ভূমিকা ছাড়াই এমন সমস্ত কথা বলবে যে কানে আঙুল দিতে হবে। এই গণতন্ত্রের কথাই কি লেখা আছে আমাদের সংবিধানে?

যাই হোক, আমরা দু-জনে গজগজ করতে করতে দোকানে গেলাম। মেজাজ খারাপ থাকায় যা কেনার তাড়াতাড়িই কিনে ফেল্লাম। রাত আটটার মধ্যে ফিরে এলাম রাধাকুঞ্জে। নিশাদি একতলায় থাকেন। প্রায় এক মিনিট ধরে বেল বাজাবার পর কোনোক্রমে দরজা খুললেন ডক্টর ভক্ত। চলাফেরায় তাঁর কষ্ট হয়। তখন হাঁপাচ্ছেন। খালি গা। পরনে একটা তোয়ালে। বোঝা যায়, তোয়ালেটা ভেজা। তবে অন্য সময়ের তুলনায় দুই চোখে অধিক সচেতনতা। আমাকে দেখে একটু ঘাড়ও কাত করলেন।'

রত্নময়ী সামান্য বিরতি নিলেন। জলের গেলাস তুলে নেন। গলা ভেজান। কপালে গলায় চিকচিকে ঘাম। এখন তাঁর অভিব্যক্তিতে বিষাদের আতঙ্কের প্রলেপ। উপস্থিত সকলের পূর্ণ দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর।

তিনি আবার বলতে থাকেন, 'আপনারা বিশ্বাস করবেন

কিনা, জানি না, একতলা থেকে চারতলায় উঠতে আমার যেন হঠাৎই খুব কষ্ট হল— যে রকম সচরাচর হয় না। অদ্ভুত একটা গুমোট ভাব! প্রতিটি ধাপ নোংরা, শ্রীহীন, দেওয়ালেরও হতশ্রী অবস্থা, অথচ এরকম তো কখনও আগে মনে হয়নি। আমার মধ্যে একটা সাধারণ জেদ থাকে, বিপদের হুমকিকে হয় বরাবর এড়িয়ে গিয়েই কিংবা উপেক্ষা করেছি। সেই প্রথম সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ে কেন যেন মনে হল, সাংঘাতিক এক দুর্ভাগ্য বা বিপদ বুঝি অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য। এর আগে কোনোদিন এধরনের হ্যালুসিনেশন আমাকে অধিকার করেনি।

নিজের ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম, দরজাটা ভেজানো। এরকম কিন্তু কখনও হয় না। আমার স্বামী হুঁশিয়ার লোক। আগন্তুক অপরিচিত হলে কপাট খুলবেন না কথা বলে সন্তুষ্ট না হওয়া অবধি। আবার আগন্তুক পরিচিত লোক হলে তাঁকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে অবশ্যই দরজা বন্ধ করে দেবেন। হয়তো এটা এ কারণে যে, তিনি সর্বক্ষণ সচেতন— তাঁর এই নিবাসে রয়েছে বহু লক্ষ টাকার প্রত্নসামগ্রী।

দরজা তাই ভেজানো দেখে সামান্য থমকালাম। তারপর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেলাম সেই ভয়াবহ দৃশ্য। উঃ!'

আর একবার দু-হাতে মুখ ঢাকলেন রত্নময়ীদেবী। থরথরিয়ে কাঁপছে তাঁর শরীর। এবার আঁখিই তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে গেল বেসিনের কাছে। রত্নময়ী বমি করলেন। আঁখি বেসিনের কল খুলে দিল।

বেসিনের পাশে ছোট একটি জানালা। জানালাটা খুলে দিল আঁখি। আকাশ দেখা যায়। অল্প অল্প বাতাস। অনেক উঁচুতে সরু চাঁদ। গোল গোল মেঘের টুকরো ছড়িয়ে আছে। আবহাওয়া দপ্তর অবশ্য কোনো আশার কথা শোনাতে পারেনি। আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টাতেও বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নাস্তি।

চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেওয়ায় রত্নময়ীদেবী এখন কিছুটা সুস্থ ও স্বাভাবিক। তখনও আঁখি তাঁকে ধরে রয়েছে। তিনি তাঁর পরবর্তী বিবরণটা দিলেন অনেক কম কথায়, 'দেখলাম, তিনি পড়ে আছেন মেঝেতে। মাথার খুলি ফেটে কয়েক টুকরো। সারা ঘর টাটকা রক্তে থইথই। সমস্ত ঘর লণ্ডভণ্ড। আততায়ী অল্প সময়ের মধ্যে যতটা পেরেছে হন্যে হয়ে খুঁজেছে তার প্রার্থিত বস্তুকে। খুঁজেছে, কিন্তু পায়নি। বাথরুমের চোরকুঠুরিতে যা ছিল, সবই রয়ে গেছে ঠিকঠাক। আসুন আপনারা, আমি আপনাদের দেখাব আমার স্বামীর সারা জীবনের সংগ্রহ কতগুলি অমূল্য প্রত্নিদর্শন।

রাত ঠিক এগারোটা। তবুও ড. জগন্নাথ ভক্তর ফ্ল্যাটে সদলবলে ঢুকল অনুত্তম। নিশাদেবী স্পষ্টত বিরক্ত হলেও নিজেরাই এক একটি চেয়ার টেনে বসে পড়ে। প্রায় যেন ঘিরে ফেলেছে ড. ভক্তকে। টিউব লাইটের আলো জোরালো। এ-সি চলছে। তাই যেন মৌমাছির মিহি গুঞ্জনের শব্দ। ইজিচেয়ারে ঝুলে থাকা অতিকায় বাদুড়ের মতন দেহ নিয়ে বসে রয়েছেন ড. জগন্নাথ ভক্ত। খুঁজছেন হয়তো আলো বা অন্ধকারের উৎসকে। কিংবা হয়তো গোনার চেষ্টা করছেন অদৃশ্য কড়িকাঠকে। অত মানুষের আগমনকেও আমল দিচ্ছেন না। কোনো জড়সড় ভাবও নেই। মরা মাছের দুই চোখে নেই বিন্দুমাত্র স্পন্দনও।

কথা বলল অনুত্তমই প্রথম, 'আমি খুব লজ্জিত আপনাদের দু-জনকে এত রাতে বিরক্ত করার জন্য। তবু এলাম এই কারণে যে, আপনারা মৃত অসীম সরকারের সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন। আপনারাই সবচেয়ে শুভানুধ্যায়ী রত্নময়ীদেবীর। হয়তো জানেন কিংবা জানেন না, রত্নময়ীদেবীর বাথরুমে রয়েছে একটা চোরকুঠুরি— যেখানে আছে মহামূল্যবান এক প্রত্নতাত্ত্বিক মূর্তি। মা কংকালেশ্বরী। আমি তো বিস্ময়ে স্তম্ভিত। আমার ঠিক আইডিয়া নেই। তবুও মনে হয়, চোরাবাজারে ওই শিল্পের দাম চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকা হবেই।'

অনুত্তম কথাগুলি বলছে সকলের উদ্দেশে।

কিন্তু আঁখির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী নজর ড. জগন্নাথ ভক্তর ওপর। মরা চোখে বিদ্যুতের ঝলকানি। দুই হাতের মুঠি একবার খোলে, আর একবার বন্ধ হয়। চোয়ালের শিরা দাপায়। দুই পা সজোরে ধাক্কা মারতে চায় মেঝেতে।

অনুত্তম সবিনয়ে তার বক্তব্য শেষ করে, '... তাই রত্নময়ীদেবীও নিরাপদ নন। ওই বস্তুর টানে আবার হয়তো খুনি হানা দিতে পারে। আপনারা একতলায় আছেন। তাই আজকের রাতটুকু একটু সজাগ থাকুন, প্লিজ। কাল থেকে

Mahavir Institute of Education & Research

Affiliated with I. C. S. E.

&

I. S. C.

17/1, Canal Street, Kolkata - 700 014

Ph. No. 2265-5821/22

A School of UKG to Class - XII

(English Medium)

For Boys & Girls

যাতে পুলিশের প্রহরা বসে যায়, সে বন্দোবস্ত আমি করছি। শুধু আজকের রাতটা।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন তাঁরা। হঠাৎই ঘুরে তাকায় অনুত্তম। ডক্টর ভক্ত প্রায় উঠে দাঁড়িয়েছেন। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে আছেন। দুই চোখ জ্বলছে।

খেমকার অফিসঘরে ঢুকে প্রায় বন্যপ্রাণীর ক্ষিপ্রতায় অতঃপর অনুত্তম চৌধুরী যা যা করল, তা বুঝি একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব। উপস্থিত কারোর চিন্তাজালকেও ছিন্ন হবার সুযোগ সে দিল না। অথচ হাঁকডাক বলতে যা বোঝায় তাও নেই। প্রথমেই নির্দেশ খেমকার প্রতি, 'আপনি এক্ষুনি বাহাদুরকে পাঠিয়ে স্থানীয় হোটেল থেকে আমাদের ক'জনের জন্য রুটি তরকারি আনান রাতের খাবারের জন্য। খরচ কিন্তু আমার। দ্বিতীয়ত, আপনার বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিন, আপনি রাতে ফিরছেন না। তৃতীয়ত, কালক্ষেপ না করে এখুনি এয়ারপোর্ট থানার অফিসার ইন চার্জ হরিসাধন বলকে জানান, আমার কথা এবং অনুরোধ করুন, জনাকয়েক পুলিশকে পাঠাতে। কারণ, আমি বলছি, খুনি এই রাতেই হাতেনাতে ধরা পড়বে। চতুর্থত, আমি এখনই 'সি' ব্লকের চারতলায় একা উঠে যাচ্ছি। আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রাখবেন। পরে খাবো। আর আপনার ফোনে আমি মিস কল দিলে আপনারা সকলে ছুটে

KALI PIGMENTS PVT. LTD.

Manufacturers of Red Lead, Litharge & Lead Sub-Oxide

1/4C, Khagendra Chatterjee Road
Kolkata - 700 002, W.B. India
Mobile : 98367 98663, Email : rinku_kej@yahoo.com
E-mail : kamal.kishore64@yahoo.com

AERO
B I C Y C L E S

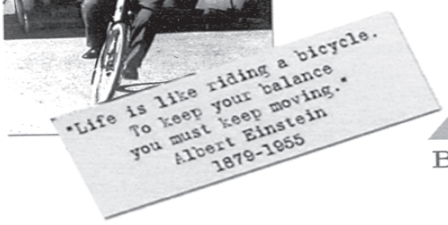

D. S. ENGINEERS & CONSULTANTS
73, Bentick Street, 1st Floor, Kolkata - 700 001
M : 9331741971, Ph, - 033 40648081,
www.silverlinetyres.com e-mail : sdhanania@gmail.com

CYCLE & VAN
TYRES TUBES & RIMS

আসবেন 'সি' ব্লকের চারতলায়। ব্যাস, আর কথা নয়। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।'

শিকার-সন্ধানী শ্বাপদের মতন ছুটে বেরিয়ে গেল অনুত্তম। কেউ কোনো কথা বলার সুযোগই পেল না। রাধাকুঞ্জের রহস্যময় আধার যেন লুফে নিল অনুত্তমকে। এতক্ষণে বইতে শুরু করেছে ফুরফুরে বাতাস। বেলফুলের হালকা সুবাসও আসছে কোনো এক উৎস থেকে। পায়ে বুট থাকা সত্ত্বেও কীভাবে নিঃশব্দে হাঁটা যায় সে কৌশল অনুত্তমের আয়ত্তে। এই রাতের নাট্যমঞ্চে সে-ই নায়ক।

আরম্ভ পুনরায় আরোহণ। চারতলায় উঠে গেল অনুত্তম। চারতলাতে চারটে ফ্ল্যাট। একটি মাত্র ফ্ল্যাট বিক্রি করতে পেরেছেন শিবকুমার খেমকা— যেখানে এই মুহূর্তে রত্নময়ী সরকার সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। অনুত্তম কিন্তু চারতলাতেই দাঁড়িয়ে পড়ল না। সে আরও এক রাউন্ড সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছে গেল ছাদে ওঠার কপাটের সামনে। ঠেলতেই খুলে গেল সেটা। প্রশস্ত ছাদের প্রান্তভাগে এলোমেলোভাবে স্থির হয়ে আছে কতগুলি ব্যবহারের অযোগ্য জিনিস, সিমেন্ট ও বালির ছেঁড়া ব্যাগ, ছেঁড়া লেপ, ভাঙা চেয়ারটেবিল, কাঠকুটো, কোমরভাঙা জলের ড্রাম, পুরনো আমলের ডাণ্ডিভাঙা ম্যাগনাম সাইজের ছাতা। ছাদে একটা চক্কর কেটে আবার ছাদের দরজার আড়ালে ওঁৎ পেতে দাঁড়ায় অনুত্তম। সেই দাঁতচাপা শপথ ও অপরাধীকে হাতেনাতে পাকড়াবার তীব্র বাসনা তার ঘাড়ে চেপে বসেছে। এ অঙ্ক যে ভুল হবার নয়, অনুত্তম তা জানে। গভীর জলে বিচরণরত প্রাণীর ন্যায় সে নিঃশব্দ, যদিও তার এই উত্তেজনা ভয়ানক নিদ্রাহরণকারী। খুব ইচ্ছে হচ্ছে সিগারেট ধরাতে। কিন্তু উপায় নেই। কারণ—

কারণ শিকার যে প্রায় সিঁড়ি গুণে গুণে উঠে আসছে, শব্দ পেল অনুত্তম।

হলুদ আলোতে সে দেখতে পেল আততায়ীকে। সে আর সেই অথর্ব, বৃদ্ধ নয়, নয় কোনো স্মৃতিভ্রষ্ট নির্বিরোধও। সে এখন এক মহাপ্রতাপশালী পেশল দানব। লোভ ও হিংস্রতায় সমাহিত। তার দেহের জিওগ্রাফিই বদলে গিয়েছে। দেখলেই মনে হবে, এই ব্যক্তি বয়সকে অতিক্রম করতে এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যার সঙ্গে তুলনা করা যায় বর্তমান বঙ্গের অতি নিম্নস্তরের রাজনৈতিক গুণ্ডার— যে প্রহারে তথা খুনে সিদ্ধহস্ত। ওই যে তার হাতে একটা বড়সড় শাবল। যার সবিক্রম ব্যবহারে সে একটি মানুষের খুলিকে মিছরির দানার মতন ভেঙে চুর চুর করে দিতে সক্ষম। এই মোক্ষম আয়ুধের ব্যবহার যথার্থ হলে উদ্দেশ্য পূরণ হবেই। দরকারই হয় না পিস্তল, ভোজালি অথবা পেটোর। যুগ থেকে যুগান্তরে বারবার পরীক্ষিত হয়েছে যে অস্ত্র সে তার ওপরই নির্ভরশীল। আততায়ী ডোরবেল পুশ করল। পাখি ডেকে ওঠে সুরেলা স্বরে। কপাট খুলল না। আবার পুশ। আবার সেই ঝংকার। কপাট খুলতে চলেছে।

শাবলটা ডান হাতে বাগিয়ে ধরেছে আততায়ী।

রত্নময়ী দরজা খোলার আগেই অনুত্তম প্রায় লাফ দিয়ে নামল ওপর থেকে হাতে উদ্যত পিস্তল, 'শাবলটাকে মাটিতে ফেলুন মিস্টার ভক্ত। না হলে আপনার ওই হাতকে আঘাত করবে আমার পিস্তলের গুলি। আমার লক্ষ্যভেদের রেকর্ড কিন্তু খুব ঝকঝকে।

ভক্ত হাঁ করে তাকিয়ে আছেন অনুত্তমের মুখের দিকে। রত্নময়ী দরজা খুললেন।

রাধাকুঞ্জে পুলিশের গাড়ি যে ঢুকছে, তার আওয়াজও কানে এল।

With the best Compliments from :

Phone : 2237-5919
2237-2090
2237-2822
Fax : 2237-0269
E-mail : kolkata@allindatpt.com
Web-site : www.allindiatpt.com

ALL INDIA ROAD TRANSPORT AGENCY
AIRTA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
ALL INDIA PACKERS & MOVERS

H.O. : 28, BLACK BURN LANE,
KOLKATA-700 012

Time Guaranteed delivery. Transporters for all over India, Marine type ISO Container trucks available. Bank-approved specialists in ODC Cargoes by heavy duty Trucks & Trailers. Specialists in packing of household goods & Transpotation. Branches & Association all over India.

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

—ঃ সৌজন্যে ঃ—

মনমোহন চৌধুরী

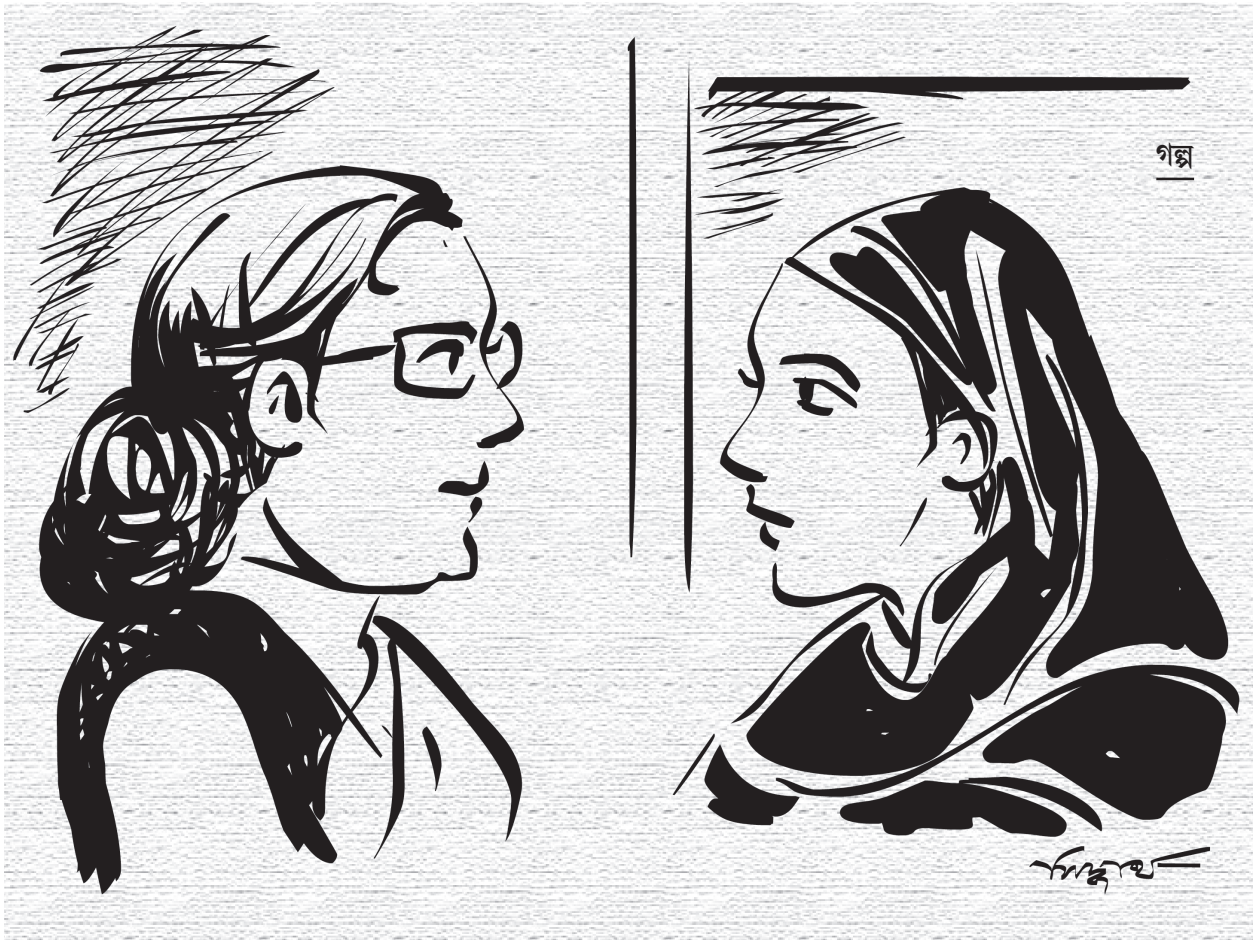

একতলার বাসিন্দা

এষা দে

আমার বাড়ির একতলাটা আবার খালি হয়ে গেল।

এই তো সেদিনের কথা। ওটা কিনলেন দীননাথ ত্রিবেদী। ভদ্রলোকের নাম আসলে ইরফান রহমান। ব্যবহার করেন মুসলমান হওয়ার আগের নাম। তথ্যটি কেনার কথাবার্তা বলতে এসে প্রথমেই সগর্বে জানিয়েছেন মিসেস ত্রিবেদী, আতিয়া খান। অধিকতর গর্বে ঘোষণা, তাঁর পূর্বপুরুষ খোদ বাবরের সঙ্গে সমরখন্দ থেকে এসেছিলেন। উল্লেখ করলেন, পার্কসার্কাসে তাঁর আব্বার একটা বিরাট পৈতৃক ম্যানশান ছিল, যার বেশিরভাগ অংশের ভাড়াটে, ন'টি সন্তানের ভরণপোষণ উচ্চশিক্ষা বিয়েশাদি সব খরচ মিটিয়ে গেছেন। রাজ্য সরকারের আমলাগিরিতে এত সম্ভবপর ছিল না। বিশেষ করে বিলেত-টিলেত পাঠানো। তাঁর এন্তেকালের পর ইংল্যান্ড আমেরিকা, কানাডায় ছড়িয়ে থাকা সন্তানেরা ভাগ-বাঁটোয়ারার তাগিদে সেটি বেচে দিয়ে যে যার ডলার পাউন্ডের দেশে ফিরে গেছে। আর মিসেস ত্রিবেদী একমাত্র ওয়ারিশ যিনি পড়ে রইলেন দেশে। কোনোক্রমে ভাড়া বাড়িতে কাটিয়েছেন অনেক বছর। এখন বয়স হয়েছে, নিজেদের একটা আস্তানা না হলেই নয়।

এদিকে আমি ফোনে 'ত্রিবেদী' পদবী শুনে কথা বলতে রাজি হয়েছি। এ পাড়ায় বড়সড় অবশিষ্ট হিন্দু বাড়িটি ঘটনাচক্রে আমার স্বর্গত স্বামীর। তৈরি করেছিলেন আমার শ্বশুর। সে সময়ে এ পল্লীতে হিন্দুদের

বিস্তৃত বসবাস। ইদানীং এখানে কোনো জমিবাড়ি বেচতে গেলে হিন্দু ক্রেতা পাওয়া যায় না। আমি একা বিধবা, নিঃসন্তান। এতবড় বাড়ি দরকার নেই, নির্ভরযোগ্য ভাড়াটে পাওয়া দুর্লভ। কাজেই এমন ক্রেতা চাইছিলাম যিনি অন্তত মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাট প্রতিবেশী হবেন। এ পর্যন্ত যারা আসছিল তাদের কথাবার্তা চালচলন যেন কেমন কেমন। কানাঘুষা শুনি এইসব স্থানীয়দের বকলমে বাংলাদেশিরা সব হাতিয়ে নিচ্ছে। ভয়ে এগোই না।

ত্রিবেদীরা অন্তত ভারতীয় এবং শিক্ষিত। ভদ্রমহিলা উইমেনস্ কলেজে ইতিহাসের প্রাক্তন প্রধান, স্বামী আগে বম্বেতে বিজনেস করতেন, এখন কলকাতায় করেন। দুজনেরই চেহারা প্লেজেন্ট, মনে হয় যেন আগেকার দিনের বিজ্ঞাপনের মেইড ফর ইচ আদার কাপ্‌ল। মিসেস একটু ভারী হয়ে গেছেন বটে, তবে চোখেমুখে চটক আছে। মিস্টার ত্রিবেদী তো রীতিমতো সুপুরুষ, লম্বা পাতলা ছিপছিপে গড়ন, সুন্দর কাটা কাটা নাক-চোখমুখ, মুখের ভাবে সংবেদনশীল কমনীয়তা। আদৌ বৈষয়িক কর্পোরেট টাইপ নন। ধরনধারণেও ভারী ভদ্র, শিষ্ট। তবে বয়সে মনে হল স্ত্রীর চেয়ে বেশ বড়। কথাবার্তা মহিলাই বললেন। দরাদরিতে অতি ঝানু, সঙ্গে শাসক দলের প্রভাবশালী সংখ্যালঘু নেতার উকিল কন্যা।

একতলায় নতুন বাসিন্দাদের ছেলে আরিফ পড়ে সেন্ট জেভিয়ার্সে, মেয়ে সায়রা লোরেটোয়। যাক, বাড়িটা এখন জমজমাট। আমি বরাবর প্রাইভেট কোচিং সেন্টারে নবম থেকে বারো ক্লাসের সায়ান্স সাবজেক্টস পড়াই। এসব জায়গায় সরকারি স্কেল যেমন নেই তেমনি আবার নেই অবসরের বয়স বা ছুটির তেমন কড়া নিয়ম। সকাল সন্ধে দু'বেলা ক্লাস। স্বামী মারা যাওয়ার পর শুধু সকালটাই করি। বিকেলে সংসারের বাজারহাট, আত্মীয়স্বজনের আসা-যাওয়া। মোটকথা সারাদিন নিজের রুটিনে বাঁধা। প্রথম দিকে একতলার বাসিন্দাদের সঙ্গে আমার আদান-প্রদান শুধুমাত্র সমস্যাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, পাম্প পুরো চালানো হয়নি, জল ফুরিয়ে গেছে বা গ্যারেজের দেওয়াল দিয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। আসলে এ বাড়ি তো ফ্ল্যাট হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একতলা তৈরি নয়, অনেক কিছু জয়েন্ট রয়ে গেছে। সাধারণ, মেয়েটাই হাজির হয় এসব বায়না নিয়ে। টিপিকাল ইংলিশ মিডিয়ামের প্রোডাক্ট, ইংরেজি ছাড়া কথা বলে না। তার মা অবশ্য বাংলাই বলে, একটু হিন্দি আর ইংরেজি মিশিয়ে। বাড়িতে ঢোকার সদর দরজাটা কমন। কাজেই আসতে যেতে অবধারিত দেখা সাক্ষাৎ। এর মধ্যে আবিষ্কার, পড়াশুনায় আমি ও মিসেস ত্রিবেদী সমসাময়িক। আমি কো-এড কলেজে, ও মেয়েদের প্রতিষ্ঠানে। মিসেস চৌধুরী মিসেস ত্রিবেদী থেকে শান্তা ও আতিয়া। আপনি থেকে তুমি। কে আসছে যাচ্ছে দুজনেই টের পাই। পরে পরস্পরের কাছে পরিচয় দান।

এই আত্মীয়স্বজনের যাতায়াতেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। প্রিয় ভাগ্নে ছোট ননদের ছেলে অভ্রনীল ওরফে নীল সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ে, সময় পেলেই চলে আসে আমার কাছে। ত্রিবেদীদের আগমনের পর আরিফের সঙ্গে তলায় প্যাসেজে দেখা। ওরা ক্লাসমেট, একই অনার্স। কাজেই এখানে এলেই ওপরে নিয়ে এসে আড্ডা, রোল আর কোক এনে খাওয়া-দাওয়া। পরে শুনি আরিফের দুঃখের বৃত্তান্ত। সকলের বাবা-মা ছেলেমেয়েদের ইউ এস এ, কানাডা, নিদেনপক্ষে অস্ট্রেলিয়ায় হায়ার স্টাডিজের জন্য পাঠাতে চেষ্টা করেন, আর আরিফের বাবা সোজা বলে দিয়েছেন, তাঁর অত টাকা নেই। যদি মেরিট থাকে, ফুল স্কলারশিপ জোটাতে পারে তবে উনি প্যাসেজের টাকা দিতে চেষ্টা করবেন। আরিফের যা রেজাল্টের নমুনা তার পক্ষে ফুল স্কলারশিপ জোটানো অসম্ভব। আসলে আঙ্কেলের সব টাকাপয়সা তাঁর অন্য বউয়ের ছেলেদের দিয়েই তো মুশকিলটা হয়েছে।

'অন্য বউ! মানে?'

'ও তুমি জানো না বুঝি! আন্টি মানে আরিফের মা তো সেকেন্ড ওয়াইফ। ওঁর জন্যই তো আঙ্কেল হিন্দু স্ত্রীকে ডিভোর্স করে মুসলমান হয়েছেন।'

গল্পের গন্ধ পাই। একদিন বাজার থেকে ফেরার সময় মুখোমুখি আতিয়ার সঙ্গে দেখা। এসো না ওপরে, একটু চায়ের সঙ্গে কথাবার্তা হবে। আসে। দুজনে মিলে শিক্ষার মান, ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগের ক্রমঅবনতি আলোচনা করি। লক্ষ্মীদির হাতের নিমকি আর হালুয়া খেয়ে তার সখেদ মন্তব্য, 'তোমার লক্ষ্মীদি একটি অ্যাসেট। আর আমার আজ হাসিনা কাল মর্জিনা, পরশু শেফালিদের নিয়ে জিন্দেগি বরবাদ। হিন্দু গরিব শ্রেণীর মেয়েদের বাড়ির কাজের একটা কালচার আছে,

মুসলমান গরিবদের কিচ্ছু নেই।'

' কী যে বল। হিন্দু-মুসলমান কোনো মডার্ন বাঙালির ওয়ার্ক কালচার নেই। লক্ষ্মীদি নেহাৎ সেকালের মানুষ বলে চলছে। চলছে মানে বাড়িতে থাকে, আমার আর ওর রান্নাটুকু করে। তার আজ এখানে ব্যথা কাল ওখানে, বুক জ্বালা, অম্বল নিয়ে ঘ্যানঘ্যান লেগেই আছে। সব মোটা কাজের জন্য আলাদা লোক লাগে। সে তো তোমার হাসিনা মর্জিনা শেফালির মতো। পিছনে লেগে লেগে প্রাণ ওষ্ঠাগত, একই স্টোরি।'

তারপর থেকে মাঝে মধ্যে একতলা থেকে আতিয়ার দোতলায় আগমন। সংসারের দৈনন্দিন সমস্যার পারস্পরিক ফিরিস্তি বিনিময় চলে। বাড়তি শুনি সমানে অভিযোগ, মুসলমানদের এ দেশে দুর্দশা। সর্বদা তারা ভিক্টিম। যেমন আতিয়া। মিক্সড ম্যারেজের দরুণ ভালো লোকালিটিতে বাড়িভাড়া পাওয়া পর্যন্ত তার শক্ত ছিল। বাধা দিই, 'মিক্সড্ কোথায়! তুমি তো বললে মিস্টার ত্রিবেদী মুসলমান হয়ে রীতিমতো মেহের দিয়ে শাদি করেছেন। মুসলমান পাড়ায় পেতে অসুবিধা কী!'

'আসলে হিন্দু নাম ব্যবহার করা হয় তো। এ দেশে এটাই রেওয়াজ। যেমন শর্মিলা ঠাকুর।'

'আরে, রেওয়াজ টেওয়াজ কিচ্ছু নয়। এই তো কবীর সুমন, দিব্যি ধর্মের সঙ্গে চাটুয্যে পদবীটা ছেড়ে দিয়েছেন। মিস্টার ত্রিবেদীও ইরফান দীননাথ হতে পারতেন।'

একটু চুপ করে থেকে আতিয়া বলে, 'সত্যি কথা বলতে কী এত ঝামেলা এত কষ্ট শাদি নিয়ে আমাকে ভোগ করতে হয়েছে যে আইনমতে নিকাহ সেরেই আমি খুশি। আর কিছু ভাবিনি।'

'এত কীসের ঝামেলা? সেকুলার দেশ, সব রকম স্বাধীনতা আছে। হোয়াটস্ দ্য প্রবলেম?' কিচ্ছু না জানার ভান করি।

'প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, এ দেশ সেকুলার শুধু নামেই। রিয়েল লাইফে মুসলমান হওয়া যে কী শাস্তি তোমরা হিন্দুরা কল্পনা করতে পারবে না। আমাকে শাদি করা নিয়ে মিস্টার ত্রিবেদীর ফ্যামিলি যে কী টেরিব্‌ল কাণ্ড করেছিল, আমাদের ওপর কী টরচার চলেছিল, তা তুমি ইমাজিন করতে পারবে না।'

'তাই? শুনে খুব খারাপ লাগছে। কারা করল এসব?' ইচ্ছে করেই ন্যাকা সাজি।

'কারা আবার? ওঁর ফার্স্ট ওয়াইফ আর তার দুই লেড়কা।'

'ওঃ! উনি বিবাহিত ছিলেন, বড় বড় ছেলেটেলেও ছিল! সেইজন্যই আপত্তি। এতো পরিবার ভাঙাভাঙি কেস। কোন স্ত্রী চায় অন্য কাউকে নিজের স্বামী দান করতে? ছেলেমেয়েরাও চায় না বাবা তাদের মাকে ছেড়ে অন্য কারো সঙ্গে সংসার করুক। এটা তো ইউনিভার্সাল। এর সঙ্গে তোমার মুসলমান হওয়ার কী সম্পর্ক?'

'আমি শিওর হিন্দু হলে তাদের রিঅ্যাকশন এরকম ভায়োলেন্ট হত না। দেখ, আমার জন্য ফ্যামিলি ব্রেকআপ হয়নি। ওঁদের রিলেশান আগেই কোল্ড হয়ে গিয়েছিল। দ্যাট ওম্যান ওয়াজ আর সোশ্যালাইট, পার্টি-ফার্টি শখের সোশ্যাল ওয়ার্ক নিয়েই থাকত। হ্যাঁ, লেড়কারা ভাল মানুষ হয়েছে, একজন ইঞ্জিনিয়ার, অন্যজন চার্টার্ড। তার ক্রেডিট পার্টলি মহিলার হতে পারে। কিন্তু ত্রিবেদীর সঙ্গে তখন এতটুকু রিলেশান? বয়সও হয়েছিল। দেখ শান্তা, উই অল নো মেয়েরা চট করে বুড়িয়ে যায়। পুরুষরা যায় না। ন্যাচারালি হাজব্যান্ডের নজর ইয়াং কারোর দিকে পড়বে।'

অর্থাৎ বিয়ে মানে শুধু বৈধ শারীরিক সম্পর্ক। সমালোচনা করি না। গল্পটা শুনতে হবে। হেসে বলি, 'তুমি বুঝি সেই ইয়াং আদার ওম্যান? তা খাতিরটা হল কী করে?'

'মিস্টার ত্রিবেদী রেগুলার কলকাতায় আসতেন কারবারের কাজে। ওঁর একটা হবি ছিল, ইন্ডিয়ান ক্ল্যাসিকাল মিউজিক। আমারও। ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সে আলাপ। ক'রাত ওখানে একসঙ্গে বসে ভাব। তারপর এখানে কোন প্রোগ্রাম হচ্ছে অ্যাড দেখলেই জানাতাম, তখন তো মোবাইল ইন্টারনেট ছিল না। রীতিমতো ট্রাংক কল। অবশ্য এক-দু'বারই করেছি। তারপর থেকে উনি মাঝে মাঝে ফোন করে খবরাখবর নিতে থাকেন। এই ভাবেই স্টার্ট আর কী।'

'বলতে গেলে তোমারই ইনিশিয়েটিভ, তাই না? সত্যি করে বল তো, তুমি ওঁকে দেখেই মজেছিলে কিনা? তখন তো উনি নিশ্চয় দারুণ হ্যান্ডসাম এবং মালদার! এবং কালচার্ড। এমন কম্বিনেশান বড় একটা পাওয়া যায় না। কী বল?'

হেসে ফেলে আতিয়া— 'এক্কেবার রাইট। আমরা মুসলমানরা কোনো কিছু চাইলে সেটা পাওয়ার জন্য ফাইট করি। অলওয়েজ। বেঙ্গলি

Shop- 6534-9088, 28381039
Resi.- 24455782
M.- 9674925123

PAINTS

Dulux *Computerised Colour*

ELEGANT STORES

Stokist of

2K Paints & Delux of Akzonobel & other paints of

ICI & Elga Paints & Polymers

Selected Hardware, Lubricants, Stationary & Aluminium Products

33, Tollygunge Circular Road.
(Mahabir tala Sital Sadan)
Kolkata-700 053

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই—

Geeta SAREES

Golden Collection

M/s. Sharda Textiles

আমি বিশেষ পড়তে পারি না। কিন্তু ক্ল্যাসিকাল মিউজিক নিয়ে তোমাদের অনেক ভাল ভাল বই আছে। সেগুলোয় অনেক ডায়লগ হিন্দিতে থাকে। তাই দু-একটা পড়তে চেষ্টা করেছি। 'মজলিশ' নামে বইটায় দেখো, বেগম আখতার ঋতা গাঙ্গুলি নামে একটি মেয়েকে তাঁর কাছে নাড়া বাঁধাবার জন্য কীরকমভাবে তাকে খাতির করতেন। যেন মনে হবে ঋতাকে শাগরেদ না করতে পারলে তাঁর জান চলে যাবে। নবাব জমিদাররা কী আর সাধে বাঈজীদের পায়ে পড়ে থাকত।'

'তা তুমি সেই বাঈজী ট্র্যাডিশান রাখলে তো এই সব শাদিটাদি নিয়ে ঝামেলা হতো না।'

গম্ভীর হয়ে যায় আতিয়া— 'প্রথম প্রথম একসঙ্গে ফাংশানে যাওয়া, গানবাজনা শোনা, ভরতনাট্যম কী ওড়িশি নাচ দেখা, ওঁর সঙ্গে গ্রেট ইস্টার্নে হাভিং আ গুড টাইম— হোটেলটায় ওঁর একটা রুম রাখা থাকত, ইনটিমেসি, সবটাই ছিল এনজয়মেন্ট। তুমি যা বললে। ক্রমে প্রায় নেশা হয়ে গেল। সবসময় ওঁর জন্য ইনতেজার, ওঁর প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমার কাজকর্ম, ছুটি নেওয়ার প্ল্যান। নিজের লোকদের যেন ভুলেই গেলাম। তারপর হঠাৎ ত্রিবেদী একমাস দেখা করলেন না, ফোনও নেই। আমি করলাম। শুনলাম কাজে খুব ব্যস্ত। আমার কীরকম যেন খুব ভয় হল। যদি আর রিলেশান না রাখতে চান, তাহলে কী হবে আমার! ওই বাজে একটা কলেজে মামুলি নোকরি— আমরা মুসলমানরা তো ভাল কলেজে চান্স পাই না, আর বোরিং লাইফ, রিপন স্ট্রিট, রাজাবাজারের রিস্তেদারদের সঙ্গে ওঠাবসা। জানো, খিদিরপুরের আমার সেকেন্ড খালার বড়ো মেয়ের বিয়ে হয়নি, ডিপ্রাইভেশান আর রেস্ট্রিকশানসের মধ্যে সারা জিন্দগি বেচারার কেটেছে। আমরা বোনেরা তাকে পাত্তা দিতাম না। এখন আমিই কি না সেই সিচুয়েশানে। ঠিক করলাম আর একা থাকবই না। লুকিয়েচুরিয়ে অ্যাফেয়ার নয়, পাবলিকলি তাঁকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে।'

মাঝেসাঝে সান্ধ্য আড্ডায় বসে ক্রমে আতিয়ার প্রেম থেকে বিবাহে উত্তরণের বৃত্তান্তটি শোনা হয়ে গেল। বিয়ের কথা তুলতে কত গল্প বানিয়েছে, তুতো ভাইরা তাদের দেখে ফেলেছে, চাচা মামু বাড়ি বয়ে এসে নাটক করে গেছে, খবর পাঠিয়েছে দাদাদের, তারা ফোনফান করে বোনকে চাপ দিচ্ছে ইত্যাদি। এখন সম্পর্ক শেষ করলেও নিস্তার নেই, তার যা ক্ষতি হওয়ার তো হয়ে গেছে। একেই তো মাইনরিটি কমিউনিটি, কনজারভেটিভ। একজন কুমারীর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতার পর বিয়ে করাই ইমানদারি নয় কি! মিস্টার ত্রিবেদী— হ্যাঁ আতিয়া স্বামীকে সর্বদা মিস্টার ত্রিবেদী বলেই উল্লেখ করে, যেন বাইরের লোক— তাঁর জীবনকাহিনিও শুনি। ইউ পি-র প্রতিষ্ঠিত সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবার। বাবা উকিল, তিন মেয়ের পর একমাত্র ছেলে, সকলের নয়নমণি। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়ান্সের খুবই কৃতী ছাত্র। বম্বেতে চাকরি করতে গিয়ে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেন। স্ত্রীর নাম জানকী। যমজ দুই ছেলে লব-কুশ। শ্বশুরের সাহায্যে এবং নিজের চেষ্টায় ত্রিবেদী হয়ে যান ছোটখাটো শিল্পপতি। শহরে রীতিমতো পরিচিত, জীবিকায় ও সামাজিক বৃত্তে। অতঃপর কলকাতায় যবনীসুন্দরীর সঙ্গে মোলাকাত ও মোহব্বত।

'বিয়ের স্টেজে আসতে তো সময় লেগেছে। তোমার বাড়ির লোকেরা ম্যারেড হিন্দুর সঙ্গে ভাব জমাতে দিল?'

'তখন আমি প্র্যাকটিক্যালি একা। মা মারা গেছেন। আব্বা দীর্ঘদিন বেডরিডন্, একদম সেনাইল, চিনতে-টিনতেও পারতেন না, তারপর চলেই গেলেন। দূর সম্পর্কের এক ফুফা সঙ্গে থাকতেন, চাইল্ডলেস, হাজব্যান্ড তালাক দিয়েছে। আমার ওপর টোটালি ডিপেন্ডেন্ট, আব্বুকে সেবা আর সংসার সুপারভাইজ করা ছিল তাঁর কাজ। আমার চালচলন নিয়ে টুঁ শব্দটি করার হিম্মত কোথায়? ভাইবোনেরা সব বাইরে, বাড়ি বিক্রির কিছুই তখনও শুরু হয়নি। সেই মাঝখানের সময়টায় আমি একটা আনসেট্‌লড অবস্থায়। প্রাইভেট কলেজে কাজ, স্যালারি তেমন নয়। কোনো জব স্যাটিসফ্যাকশন নেই। এদিকে ফ্যামিলির বাকি সবাই শাদিশুদা। এমনকী আমার ছোট বোনরাও ছেলেমেয়ের মা।'

'কিন্তু তোমার যা রূপগুণ, যেরকম বাড়ির অবস্থা, তাতে নিজেদের কমিউনিটিতে পাত্র পাওয়া তো মোটেই শক্ত হতো না।'

'সে সময়ে এখানে কোয়ালিফায়েড মুসলিম ছেলে ক'টা? আর একটা প্রবলেম আমার আবার পাকিস্তানি বা বিদেশে সেট্‌লড চলবে না। আমি তো যেতাম আপা মানে দিদিদের কাছে, ঢাকা, ইসলামাবাদে। বাব্বা, একটা মফস্‌সল টাউন আর

একটা মিলিটারি ব্যারাক। একবার ইংল্যান্ডে গিয়েছিলাম, বড়দার কাছে ব্র্যাডফোর্ডে। কাঁচে আঁটা বাড়িতে টিপটিপ বৃষ্টি আর কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে রাতদিন বসে বসে একেবারে দম বন্ধ হয়ে আসে। কিচ্ছু করার নেই, পাকিস্তানি ছাড়া কথা বলার লোক নেই। কী কষ্ট! কলকাতায় ফিরে যেন শ্বাস নিয়ে বাঁচলাম।'

'আল্লাহু আকবর।' রাতের আজান ভেসে আসে। আতিয়া তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। 'নমাজের টাইম, চলি।'।— প্রতি আড্ডা আমাদের আজান শুনেই শেষ হয়।

বিয়ের পর আমি যখন এ বাড়িতে সংসার করতে ঢুকি, তখন কোনো মসজিদই চোখে পড়ত না, সারা দিনে একবারও শোনা যেত না আজান। আস্তে আস্তে চারিদিকে মসজিদ গজিয়ে উঠল। এখন ভোরবেলা ঘুম ভাঙে ফজরের আহ্বানে। আচ্ছা, পড়াশুনা চাকরিবাকরি করার সময় আতিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়ত? একদিন জিজ্ঞাসা করে ফেলি— 'না না। আমরা এত ভাইবোন তার ওপর নোকর নোকরানি। অত বড় সংসারে বেশিরভাগ শুধু ফজরের নমাজটা পড়ত আর কেউ কেউ সঙ্গে রাতে এসারেরটা। খালি আম্মি আর পুরনো রসুইয়া সবগুলো। আমাদের বেলা আব্বুর কড়া হুকুম, আগে পড়াশুনা ডিগ্রি চাকরিবাকরি, তারপর নমাজ।'

'তার মানে ইসলাম তোমার পোস্টরিটায়ারমেন্ট অকুপেশান?'

'আসলে কী জানো, মিস্টার ত্রিবেদীকে নমাজ পড়বার হ্যাবিট করাতেই আমার নিজের পড়া। বিয়ের আগে কে নমাজ আদায় করল না করল কারো গা ছিল না।'

'একজন হিন্দু কতটা সাচ্চা মুসলমান হতে পেরেছেন প্রমাণ চাই। তাই তো?'

'একজাক্টলি। গোড়ার দিকে খুব আনউইলিং ছিলেন। খালি বলতেন, আমি হিন্দু থাকার সময় ভজনপূজন করিনি, কেউ তো আমাকে তার জন্য কিছু বলত না। তোমাদের এ কড়াকড়ি কেন? অনেক সাধাসাধি করে, মিষ্টি কথা বলে, আর একটা জায়নমাজ পেতে তাঁর পাশে বসে, নিজে পড়ে পড়ে ওঁকে দিয়ে পড়াতে হত। সেটাই হ্যাবিট হয়ে গেছে।'

'কিছু মাইন্ড করো না, আদৌ মিস্টার ত্রিবেদী মুসলমান হলেন কেন? ইন্ডিয়া তো ইউরোপ আমেরিকার মতো সেকুলার, ডিফারেন্ট রিলিজিয়ানের মধ্যে বিয়ে অনায়াসে হতে পারে, তার জন্য কারও ধর্ম বদল করতে হয় না। উনি হিন্দু, তুমি মুসলমান থাকলেই তো পারতে।'

'সেরকম বিয়ে হিন্দু খৃস্টানদের মধ্যে চলে। আমাদের কমিউনিটিতে মুশকিল। ইসলামে অন্য ধর্মের সঙ্গে বিয়েশাদি না-জায়েজ। দুজনকেই মুসলমান হতে হয়। জানো তো, তানসেন হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। মুসলমানি বিয়ে করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেন। মাইন্ড ইট, তখন আকবরের জমানা, মোস্ট লিবারেল। হলিউডের স্টার রিটা হেওয়ার্থ আলি খানকে শাদি করার জন্য মুসলমান হলেন। মুসলমান দেশে একজন নন-মুসলিম কোনো মুসলিমকে বিয়ে করতেই পারে না নিজে ইসলামে কনভার্টেড না হয়ে। নট ইভন ইন ইয়োর বাঙালিমার্কা বাংলাদেশে। ইয়েস, সেখানেও নয়।'

এদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে তাহলে হিন্দুর কী লাভ? আত্মবিলোপ? ছিঃ ছিঃ! আমি একেবারে হিন্দুত্ববাদী হয়ে যাচ্ছি। আর ধর্মটর্মের কথায় যাব না।

পরের বার আড্ডায় অন্য প্রসঙ্গ তুলি।

'আচ্ছা আতিয়া, মিস্টার ত্রিবেদীর বম্বের কাজকারবার নিশ্চয় ছেলেরা দেখছে, কারবারের খাতিরে অন্তত তাদের সঙ্গে নরমাল সম্পর্ক থাকার কথা।'

'আরে ওখানেই তো প্রবলেম। আমাদের রিলেশান জানাজানি হতে ছেলে দুজনেই কী ফিউরিয়াস বাপের ওপর। পারলে মারে এমন ভঙ্গি। দিনের পর দিন চিৎকার চেঁচামেচি, আমার সম্বন্ধে যা-তা কথা। যে বাপ এমন আওরতের জন্য নিজের ছেলেদের মাকে ছাড়ে, তার নামে পরিচয় দিতে তাদের শরম লাগে। বেচারা ত্রিবেদী তো ডিভাস্টেটেড। বউ বুড়ি যে জেলাস হবে, তার রিস্তেদাররা মেয়ের হয়ে চেঁচাবে সে তো জানা কথা। কিন্তু ত্রিবেদীর নিজের আওলাদরাও পুরো তাদের মাকে সাপোর্ট করে গেল। শুধু তাই নয়, ত্রিবেদীর তিন দিদি, তাদের হাজব্যান্ডরা সবাই বম্বে এসে বেচারার ওপরে হামলা। ত্রিবেদীর মা তখন জীবিত। তিনি নাকি আমাদের শাদির ডিসিশানে, টেকেন টু বেড, খাওয়াদাওয়া করছেন না। সোজা ব্ল্যাকমেইল আর কী! নিজের মা পর্যন্ত ত্রিবেদীর দিকটা দেখলেন না। তোমরা হিন্দুরা, কিছু মনে করো না, ভয়ঙ্কর কমিউনাল। শেষে সারা জিন্দগি এত মেহনত করে তৈরি ইন্ডাস্ট্রি, দুই ছেলের নামে ট্রান্সফার করে দিতে

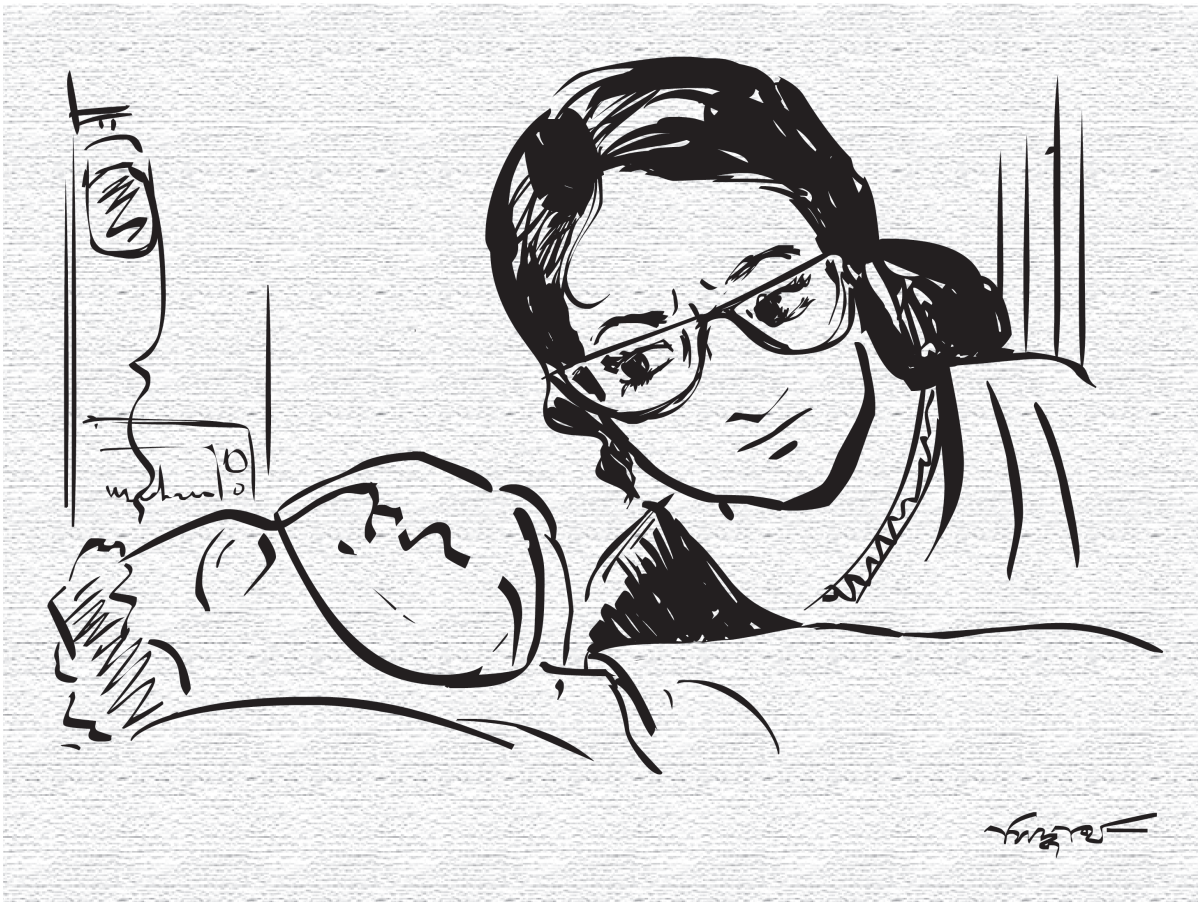

হল। বম্বের বাড়ি তো বউয়ের নামেই ছিল। আরও যা যা করেছিলেন, ইনভেস্টমেন্টস শেয়ার সব কেড়ে নিয়ে লোকটাকে একেবারে নাঙ্গা করে আমার কাছে পাঠিয়েছিল।'

'স্যাড, ভেরি স্যাড। তবে মিস্টার ত্রিবেদী তো এখানে এসে আবার কিছু করলেন, সে ক্যাপিটাল তো নিয়ে এসেছিলেন!'

'সে আর কত! তাছাড়া কলকাতা তো বম্বে নয়। লেফট্ ফ্রন্টের আমলে ম্যানুফ্যাকচারিং কারবার কী-ই বা হবে?'

মুসলমান হবার দরুণ কিছু সুবিধা পেয়েছিলেন ত্রিবেদী।
কারখানা-টারখানা এলাকা তো মুসলিমদেরই দখলে। এমন পাড়ায় ফ্যাক্টরি বানালেন যেখানে পার্টির লোকাল কমিটিতে আতিয়াদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের দাপট। এদের সাহায্যেই শুরু করতে পারলেন। কিন্তু সংসারের ঝামেলা যাবে কোথায়? আতিয়ার রান্না খাবার তাঁর মুখে রুচত না। হোটেলের ফ্রায়েড প্রন উইথ টারটার সস বা কালি মিরচি কাবাব বাড়ির হেঁসেলে কি হয়? প্রচণ্ড রাগ করতেন, ডাল আর সব্জিও নাকি তাঁর খাবার লায়েক নয়। অথচ আতিয়ার হেঁসেলের মেনু মোটেই খাজা মুসলমান পরিবারের মতো নয়। তার আব্বু চিরকাল হিন্দুদের সঙ্গে ওঠাবসা করে বিশ্বাস করতেন মাছ শাকসব্জী খেলে দিমাক আর হেল্থ দুই তন্দরুস্ত থাকে, তাই তাদের বাড়িতে সে রকম পদই রান্না হত, বড়জোর খাসি মোরগ, বিফ আসত নোকর নোকরানিদের জন্য, সস্তা তো। আতিয়া তাও আনে না। কোনো দাওয়াতে গেলে কাঁটা হয়ে থাকত, পাছে বিফ দেয়। একবার রাজাবাজারে এক শাদিতে পরোটার সঙ্গে বিফের কী যেন আইটেম করেছিল, ত্রিবেদী বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বমি। সে কি কেলেঙ্কারি। তারপর প্রায় সব বিয়েশাদিতে যাওয়া ত্রিবেদী বন্ধ করে দিলেন। ওদের সমাজের কোনো কিছুতেই ওঁর ভাগ নেওয়া সম্ভবপর হল না। এদিকে বেশি বয়সে বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করা, নতুন জায়গায় নতুন কাজকর্ম সামলানো, সঙ্গে নমাজ পড়া, রোজা রাখা এটসেটেরা করতে গিয়ে মিউজিকের শখটখ চলে গেল। তাছাড়া ইসলামে নাচগান ভালো চোখে দেখাও হয় না। আতিয়া যুক্তি

KALPATARU AGROFOREST ENTERPRISES (P) LTD.

(Leading Raw materials supplier to the Paper & Rayon Mills in India)

Head Office

22, Stephen House (II nd Floor)
56E, Hemanta Basu Sarani (Old 4E, B.B.D. Bagh)
Kolkata - 700001
Phone : 033-22430156 / 22485101 / 22311182
Fax : 033-22101238
E-mail : Kalptaru@cal.vsnl.net.in

Branch Office

"Panchvati",
2/517, Vijay Khand Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Uttar Pradesh
Phone : 3021536

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

With Best Compliments from :

C. S. SALES (INDIA) PVT. LTD.

18, Amratala Street, 1st Floor
Kolkata - 700 001

দেখায়।

'ও সব ছিল নবাব তালুকদার ক্লাসের শখ, তাও হিন্দুদের সঙ্গে মিশে। সে ক্লাসই আর নেই। ওস্তাদ পোষার মতো রোজগারই বা কই। এই মুড়িটায় কী দিয়েছে বলতো?'

আজ লক্ষ্মীদির স্পেশাল মুড়ি মাখা আর আলুর চপ চায়ের সঙ্গে। 'সিক্রেট। খেতে হলে ওপর তলায় আসতে হবে।

তোমাদের দুটি সুন্দর ছেলেমেয়ে, তাদের নিয়ে মিস্টার ত্রিবেদী নিশ্চয় সুখী।'

আলুর চপে কুট করে কামড় বসায় আতিয়া, 'আহ্! এটাও দারুণ হয়েছে। লক্ষ্মীদির কাছে রান্না শিখতে হবে। জানো, আরিফের সম্বন্ধে ওঁর বিশেষ আগ্রহ দেখি না। বরং যেন ইনডিফারেন্ট। বোধহয় ওঁর আগের লেড়কাদের সঙ্গে তুলনা করেন, তাদের ছোটবেলা, পড়াশুনায় ফার্স্ট সেকেন্ড হওয়া, স্পোর্টসে প্রাইজ নিয়ে ফেরা। আরিফ তো কোনো ফিল্ডেই তেমন কিছু নয়। তবে সায়রাকে খুব পেয়ার করেন। ভাগ্যে আগে মেয়ে হয়নি।'

'আর মেয়ের মাকে? এত কাণ্ডের নিকাহ। তারপর অনন্তকাল তাহারা সুখে বাস করিতে লাগিল, অমর প্রেম!'

আল্লাহু আকবর— আজান শোনা গেল। এক চুমুকে চা-টা শেষ করে উঠে দাঁড়ায় আতিয়া। 'দ্যাটস্ অ্যানাদার স্টোরি। পরের একদিন হবে।'

এরপর বেশ কিছুদিন আতিয়ার সঙ্গে বসা হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার জন্য তৈরি হওয়ার মরশুম। কাজের প্রেসার। বাড়িতেও কয়েকজন হাজির হয়, যারা কাছেপিঠে থাকে। তারপর আমি গেলাম ব্যাঙ্গালোরে ছোট বোনের কাছে। প্রায় মাসকয়েক পরে আমরা বসি। খুব গরম পড়েছে। আজ আর ভাজাভুজি নয়। লক্ষ্মীদির বেলের শরবত, ফ্রিজে রেখে ঠাণ্ডা করা। সঙ্গে শুকনো খোলে ভাজা চিড়েতে দু'চারটে চিনাবাদাম ছোলা ফেলে কাঁচালঙ্কা পেঁয়াজ কুচি একেবারে হালকা করে কেটে দিয়ে জাস্ট দু'ফোঁটা তেলে মাখা।

'তোমার লক্ষ্মীদি একটি জুয়েল। দেখো কেউ না কিডন্যাপ করে। আজকাল কুক পাওয়া যা ডিফিকাল্ট। তুমি পেলে কী করে?'

'শ্বশুর বাড়ির গাঁ থেকে শাশুড়ি মায়ের আমদানি।'

'শাশুড়ি ভিলেজে থাকতেন বুঝি!'

'না, না। আমাদের সঙ্গেই বরাবর থাকতেন ওঁরা। তিনপুরুষের ওকালতি। শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গেই তো বসতেন আমার স্বামী। দেশে জমিজায়গা সব ভাগে দেওয়া। মাঝেমাঝে কোর্টের ছুটিতে শ্বশুর যেতেন। খেতের ফসল আনাজপাতি কত কী নিয়ে ফিরতেন। এই বাড়ির দুটো তলা জুড়ে আমাদের জমজমাট সংসার। একতলায় ওঁরা থাকতেন, সেখানে সকালের দিনভর থাকা বসা খাওয়াদাওয়া। বলতে পার মেইন জীবনযাত্রা, সব কিছু। ওপরে তো শুধু দুটি বেডরুম, একটু বসার জায়গা, একফালি কিচেনেট আর বাথরুম ছিল। ওঁরা মারা যাওয়ার পরই আমরা দোতলাতে শিফট করি।'

'তার মানে তোমার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির রিলেশান ঠিকঠাক ছিল?'

'অফকোর্স। সবই সুখস্মৃতি। এই যে আমাদের ছেলেমেয়ে হয়নি, তার জন্য কখনো আমাকে দোষারোপ করেননি, বলতেন সবই ভাগ্য। যতদিন বেঁচেছিলেন সংসারের বেশিরভাগ দায় বয়েছেন শাশুড়িমা। ওঁর জন্যই আমার দু'বেলা কাজ করতে যাওয়া সম্ভব হতো। সকলে একে একে চলে গেলেন।'

আতিয়া শুনে যায়। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'বিয়ের আগে এত বিটারনেস এত আনপ্লেজেন্টনেস সত্ত্বেও আমি ভেবেছিলাম ছেলেমেয়ে হলে সবাই অ্যাকসেপ্ট করে নেবে। অন্তত মাদার ইন ল। বিয়ের এক বছরের মধ্যে আরিফ, তার দেড় বছরের মাথায় সায়রা— আমার তো ফর্টি হয়ে গিয়েছিল, তাই তাড়াহুড়ো। দু'বারই বলে বলে ত্রিবেদীকে দিয়ে বড়ো দিদিকে খবর পাঠিয়েছি, ওঁরা তো বেনারসেই থাকেন। কোনো জবাব আসেনি। বছর পাঁচেক বাদে হঠাৎ ত্রিবেদীর বড় জামাইবাবুর ট্রাঙ্ককল, মাঈজী সিরিয়াস, ডাক্তার বলেছেন ছেলেমেয়েদের সবাইকে খবর দিয়ে আনাতে। আমি দেখলাম এই মওকা, বুড়ির সামনে নাতি নাতনিকে হাজির করতে পারলে নিশ্চয় কাছে টেনে নেবেন। ত্রিবেদীর ভীষণ অবজেকশন, ভিন জায়গা আমার তবিয়ত খারাপ। আসলে বেশি বয়সে পরপর বাচ্চা এবং দুটোই সিজার, আমার হেল্‌থ একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। তবু জিদ ধরলাম, বেনারসের ওই মকান আমার আসল সসুরাল, ওঁদের ফ্যামিলি হাভেলি, ত্রিবেদী ওনলি সন, ওয়ারিশ। পরে আমার আরিফ সায়রা ওয়ারিশ হবে। নিজেদের হক দাখিল করি।'

'গেলে?'

'হুঁ। না গেলেই ভালো হতো। ভেরি স্যাড এক্সপিরিয়েন্স।'

শুনি বারাণসী পর্ব। আতিয়ারা পৌঁছে দেখে মাঈজী মারা গেছেন। বিরাট চকমিলান বাড়ির চত্বরের মধ্যে গোবিন্দজীর মন্দিরের সামনে তাঁকে রাখা। মিস্টার ত্রিবেদীর মতো ফর্সা লম্বা সুন্দর নাকমুখ, যেন স্ট্যাচু। শুধু চুল ধবধবে সাদা। লোকে লোকারণ্য। মেয়ে জামাই নাতি নাতনি আত্মীয়-স্বজন পাড়া প্রতিবেশী গাঁয়ের সরপঞ্চ মায় একদল ভাগচাষি পর্যন্ত হাজির। মালকিন ক'দিন ধরেই কোমায়, ডাক্তার বৈদ্য অনেকদিনই জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু ত্রিবেদী শেষমুহূর্তে জেনেছেন। শ্মশানে যাবার প্রস্তুতি শেষ একমাত্র পুত্রের মাকে শেষ দর্শনের জন্য সকলে অপেক্ষা করছে। দু-হাতে মায়ের পা জড়িয়ে ধরে মাথা ঠেকিয়ে মাটিতে বসে পড়েন ত্রিবেদী। 'মা, মুঝে মাফ কর দো।'— সেই প্রথম তাঁকে বিচলিত দেখল আতিয়া। আরিফ সায়রা ভয় পেয়ে কান্না জুড়ে দেয়। কেয়া হুয়া আব্বুকো, উও কৌন হ্যায়? দু-চারজন আত্মীয় তাদের হাত ধরে আতিয়াকে নিয়ে ভিড় থেকে বের করে বাড়ির মধ্যে তাদের জন্য রাখা ঘরে নিয়ে যায়। 'আপলোগ ইধর রহিয়ে বাচ্চেকো লেকর।'

আতিয়া হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। হিন্দুদের শেষকৃত্য তার কাছে ভয়ঙ্কর। চারিদিকে তাকায়। অতি সাধারণ যেমন তেমন একটা কামরা। তিনটে নেওয়ারের খাটে বিছানো মামুলি শয্যা, একটা টেবিল ও দুটি চেয়ার এক কোণে। দেওয়ালে লাগানো একটা বেঞ্চিতে রাখা তাদের মালপত্র। শুনেছিল ত্রিবেদীর জন্য হোটেলের পুরো সুইটের মতো ব্যবস্থা করা আছে, ধনীকন্যা আধুনিকা স্ত্রী ও দুই ছেলের উপযুক্ত। যাই হোক। অপেক্ষা করে। বাইরে কান্নার রোল। দেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যাক ত্রিবেদী অন্তত পুত্রের কর্তব্য করতে পারবেন, মুখাগ্নি। হিন্দুদের এই প্রথার কথা ভাবলেই আতিয়ার গা কেমন করে।

ভাগ্যিস শ্মশানে যাওয়া পোড়ানো এসব আতিয়ার উপস্থিতি অনাবশ্যক।

বাইরে সব চুপচাপ হলে আতিয়া হাতমুখ ধোবার জন্য বেরোয়। এক বুড়ি নোকরানি না গরিব কোনো রিলেশান, তাকে দেখিয়ে দেয় রাস্তা। একেবারে সেকেলে সিস্টেমের বাথরুম, কী করে বাচ্চাদের নিয়ে থাকবে। ঘরে ফিরে দেখে আর একজন নোকরানি তাদের জন্য খাবারদাবার এনে রেখেছে টেবিলটার ওপর— 'চাওল রোটি ডাল সব্জি লায়া। আপলোগ খানা খা লিজিয়ে, বচ্চেকো খিলাইয়ে, দুধ ভি লায়া।' আতিয়াদের ভোজনপর্ব সারা হলে বাসনপত্র নিয়ে তার প্রস্থান। বাইরেটা প্রায় নির্জন। একটু উঁকিঝুঁকি মেরে আতিয়া বাচ্চাদের নিয়ে ঘরেই থাকে। তাদের অজস্র প্রশ্নের জবাবে, এটা তাদের আব্বুর পুরানা কোঠি, মাটিতে শোয়ানো মহিলা তাদের নানি ইত্যাদি বোঝাতে বোঝাতে ক্লান্ত। কখন তাদের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে। টের পায়নি ত্রিবেদীদের আসা, শ্মশান ফেরতের অনুষ্ঠান।

ঘুম ভেঙে দেখে ত্রিবেদী তৃতীয় খাটটায় বসে। মুখ দেখে মনে হয়, এক রাতে যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে।

আতিয়া উঠে গিয়ে পিঠে হাত রাখে, 'মাঈজীর উমর হয়েছিল, বাপ-মা তো চিরকাল কারো থাকে না। আমার মা তো সেই কবে চলে গেছেন।'— ত্রিবেদী চুপ, কোনো উত্তর নেই।

'তুমি তো খবর পেয়েই এসেছ, ছেলের ডিউটি করেছ—'

মাথা নাড়েন ত্রিবেদী। না, ছেলের কর্তব্য তিনি পালন করেননি। ইরফান রহমান সারদা ত্রিবেদীর মুখাগ্নি করতে পারে না।

'কে করল?'

'লব আর কুশ, দীননাথ ত্রিবেদীর ছেলেরা।'

দিনের আলোয় বাস্তবের মুখোমুখি। অশৌচ পালন পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম কোনো কিছুতেই ইরফান রহমানের কোনো ভূমিকা নেই। সবই তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলে দু'জনের করণীয়। এবং তাঁর দিদিদের। মিস্টার ত্রিবেদী, আতিয়া ও তাদের ছেলেমেয়েরা যেন নিঃসম্পর্কীয় অতিথিমাত্র। বাইরের মহলে ঘর বাথরুম ইত্যাদির ব্যবস্থায় তাদের অসুবিধা হবার কথা চিন্তা করে বড়ো ননদ জানালেন, তাদের আরামের জন্য হোটেলে থাকার বিকল্প আয়োজন আছে। কিন্তু অন্দরমহলে ত্রিবেদীর নিজস্ব ঘরদোর কী হল? সেখানে রয়েছে লব, কুশ আর জানকী। জানকী! তাকে তো তালাক দেওয়া হয়েছে। বড়ো দিদি জানালেন, তালাক ভাইয়ের সঙ্গে হয়েছে, তাদের সঙ্গে হয়নি। এখানে ত্রিবেদী পরিবারের বংশধরদের মা জানকী। আরিফ আর সায়রাকে দেখিয়ে আতিয়া বলে, 'কিন্তু সাকসেসার মানে বংশধর তো এরাও!'

'না। এরা ইরফান রহমানের

বংশধর।'— আস্তে করে শুধরে দেন বড়ো জামাইবাবু। আতিয়া কিছু বলতে গেলে মিস্টার ত্রিবেদী থামিয়ে দেন— 'থাক এসব কথা।'

পরে ত্রিবেদী বোঝালেন, 'ওঁরা ঠিকই বলছেন। হিন্দু সাকসেশান আইন শুধু হিন্দুদের প্রতি খাটে।' — তিক্ত আতিয়া প্রচুর মেজাজ করে, এসব ইংরেজদের হিন্দুপ্রীতির ফল, মোগল আমলে কী হত ইত্যাদি।

থাকতে না পেরে আমি বাধা দিই, 'আচ্ছা, মুসলমানরা অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে মুসলমান বাপের সম্পত্তি ইনহেরিট করে?'

থমকে যায় আতিয়া। একটু চুপ করে থেকে বলে, 'জানি না। কখনো সে রকম কেস দেখিনি। মুসলমানরা তো অন্য রিলিজিয়ানে কনভার্টেড হয় না। হিন্দুরাই বরাবর হয়। শতশত বছর ধরে হিন্দুরাই মুসলমান হয়েছে, খৃস্টান হয়েছে। তাদের কাছে কনভারশান তেমন কিছু ব্যাপার নয়। আজকালই ওই হিন্দু মিলিট্যান্টদের ইনফ্লুয়েন্সে এত রি-অ্যাকশন।'

কথাই বাড়াই না। সাতশো বছর যারা বিধর্মী বিদেশির পরাধীন থাকে, তাদের ধর্মত্যাগ মলমূত্র ত্যাগের মতোই স্বাভাবিক গণ্য হয়।

'তা তোমরা কি হোটেলে শিফ্‌ট করলে?' গল্পে ফিরে যাই।

হ্যাঁ, অশৌচের দিনগুলো তারা হোটেলেই ছিল। আতিয়া সেখানেই থাকত। ত্রিবেদী ছেলেমেয়ে নিয়ে সকালে রেডি হয়ে হাভেলিতে চলে যেতেন, বড়ো জায়গা, অনেক লোকজন, বাচ্চাদের পক্ষে আইডিয়াল। ত্রিবেদীর দিদিদের ছেলেমেয়েরা আরিফ সায়রার সঙ্গে ভাব জমায়, সময় কাটায় খেলাধুলা

AVIMA EXPORTS (P) LTD.

Exporters of Quality Jute Goods & Rice

16, N. S. Road, (4th Floor)
Kolkata-700 001
Phone : 2242 9234 / 2262-2318 / 19
Fax : 2243 2659
e-mail : info@juteonline.com

With
Best
Compliments
From-

S. K. KAMANI

KHIMJEE HUNSRAJ

Head Office : 9, Rabindra Sarani,
Kolkata - 700 073
Tel. : (033) 2235-4486 / 87 / 88
3292-4221
Fax : 2221-5638
E-mail : office@khimjee.com
Web Site : www.khimjee.com

গল্পে। একদিন আতিয়া শোনে আরিফ আর সায়রাকে তারা হাভেলির চোর কুঠরি দেখাতে নিয়ে গেছে, মাটির তলায়, কত কাণ্ড করে দেখা।

'সায়রা ভয় পেয়েছিল, আমি পাইনি,' সগর্বে ঘোষণা আরিফের। 'কিসের জন্য চোর কুঠরি জানো? পাঠান ফৌজ মোগল ফৌজ হামলা করলে লুকোবার জন্য। ওরা বহুত খতরনাক জাত।'

সেদিনের পর আর আতিয়া তাদের পিতৃগৃহে পাঠায়নি। ত্রিবেদী একলাই যেতেন। লব-কুশ বা জানকীর সঙ্গে বাতচিত হত কিনা কে জানে। দেখা হত জরুর। সে সব নিয়ে আতিয়া কিছু ঝামেলা করেনি। ফাংশানের দিন জামাইবাবুদের পাশে দাঁড়িয়ে গেস্টদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার কর্তব্যটুকু একমাত্র পুত্রকে পালন করতে দেওয়া হয়েছিল।

কলকাতায় ফেরার পর ত্রিবেদী কেমন বদলে গেলেন। অনেক শান্ত, কোনো কিছুতেই আর উত্তেজিত হন না।

কাজকর্ম সংসার যেন করতে হয় বলে করা। ওই নমাজ পড়ার মতো।

'যাই হোক, শান্তিতে আছ। বাংলায় একটা কথা আছে, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।'

আল্লাহু আকবর। আতিয়া উঠে দাঁড়ায়। 'এখনো কি মিস্টারকে সঙ্গে নিয়ে নমাজ পড়?'

'না। উনি একাই পড়েন। ওঁর আলাদা ঘরে।'

'আবার এস।' মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে বিদায়।

তারপর থেকে কিন্তু আতিয়ার আসা-যাওয়া কমে গেল। বোধহয় নিঃসম্পর্কীয় কারো কাছে জীবনকাহিনি বলে ফেলে সংকোচবোধ। আমিও আগবাড়িয়ে অন্তরঙ্গতা দেখাই না। সর্বদা দুঃখের পাঁচালি শুনে শুনে একটু একঘেয়ে লাগছিল। কোচিং সেন্টারে কাজের প্রেসার কমলে বড় ননদের কাছে পুণেতে কিছুদিন ছিলাম, যেমন প্রতি বছরই থাকি। ফেরার পর একতলার ঘরে যাওয়া আসার পথে মামুলি সৌজন্য বিনিময়, কমন প্রবলেম বা টিভি সিরিয়াল নিয়ে কথা।

একদিন ঝাঁ-ঝাঁ রোদে কোচিং থেকে ফিরছি। জায়গাটা বেশি দূরে নয়। কিন্তু সরাসরি কোনো বাস-ট্রাম কিছু নেই। বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। স্বামী যতদিন ছিলেন, গাড়ি ও ড্রাইভার ছিল। হাইকোর্ট পাড়ায় ক'পুরুষের চেম্বার। ওঁর যাতায়াত ও আমাকে আনা-নেওয়া করতে গাড়ি। আমি এখন একলা, প্রয়োজন কম, গাড়ি-ড্রাইভার রাখি না। তেমন দরকার পড়লে ভাড়ায় নিই, একটা এজেন্সির সঙ্গে ব্যবস্থা করেছি। প্রতিদিনের কাজ পায়ে হেঁটে আর মিনিতে ম্যানেজ করি। আজও বেরিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছি, হঠাৎ পাশে একটা গাড়ি ব্রেক কষল—'মিসেস চৌধুরী, গোয়িং হোম?'

গাড়ির দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছেন একতলার মিস্টার ত্রিবেদী। 'আসুন, উঠে পড়ুন, আমিও বাড়ি যাচ্ছি।'

যেতে যেতে কথা হয়, সর্বত্র কোচিং ক্লাসের চলন, এখানে সায়ান্সের স্ট্যান্ডার্ড, বেঙ্গলের মেরিট তাঁরা ইউ-পিতে কত অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন, বেনারসের সঙ্গে বাঙালিদের দীর্ঘ সম্পর্ক ইত্যাদি। পৌঁছে ধন্যবাদ দিয়ে নামি।

'আপনার কি ক্লাস এই টাইমে শেষ নাকি? আমি তো লাঞ্চে বাড়ি আসি। ইজিলি আপনাকে তুলে আনতে পারি।'

'না, না। আপনি কেন বদার করবেন, কোনো দরকার নেই। থ্যাঙ্ক ইউ।'

বলি বটে, কিন্তু মনে হয় গরমের সময়টা লিফ্‌ট পেলে মন্দ হয় না। দু'দিন বাদেই আবার দেখা এবং একসঙ্গে ফেরা।

'আমি ইচ্ছে করেই আপনার সেন্টারের কাছে ওয়েট করছিলাম।'

'ছি, ছি। কেন করলেন।' তেমন জোর গলায় রাগ করতে পারলাম না।

প্রায়ই একসঙ্গে ফেরা। কোনো দিন আমাদের বিজ্ঞান পড়ায় আগ্রহ আর বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব নিয়ে কথা বলি, কোনোদিন ওঁর কারখানার সমস্যা। দুঃখ করেন, এখানকার লেবার প্রবলেম একটা অসম্ভব অবস্থায় নিয়ে গেছে ইন্ডাস্ট্রিকে। কেন বম্বেতে নেই? মজদুরদের ডিমান্ড নিশ্চয় থাকে, নিগোশিয়েশান হয়, ইন্ডাস্ট্রি লোকসান সামলে নেয়। এখানে যে স্ট্রাইকের কালচার, নো প্রোডাকশান, ক্লায়েন্টকে মাল দিতে পারা যায় না, গুডউইল নষ্ট। তার ওপর লেবারদের এক্সট্রা দিতে হলে গায়ে লাগে। বলি, এটাতো খুবই পরিচিত চিত্র বেঙ্গলে।

একদিন তুমুল বৃষ্টিতে ত্রিবেদী আমাকে তুলেছেন। 'এরকম ওয়েদারে বম্বের কথা মনে পড়ে। জানেন, ওখানে বর্ষা ভয়াবহ। প্রতি বছর কয়েকদিন কামধান্দা সব বন্ধ, ছেলেরা ওদের মা সবাই বাড়িতে,

একসঙ্গে রেইনি ডে এনজয় করতাম।'

মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, 'ওদের মিস করেন নিশ্চয়?'

চুপ করে যান ভদ্রলোক। তারপর আস্তে আস্তে মাথা হেলান, হ্যাঁ। মাঝে মধ্যে গাড়িতে স্বল্পক্ষণের যাত্রায় তাঁর অতীতের বিশেষত ছেলেদের স্মৃতি, বম্বের কাজকারবারের সাফল্য, কলকাতার ভালোমন্দ প্রভৃতি নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা বা মতামত শুনি। বুঝি এসব কথা বলার মতো আমি ছাড়া ওঁর আর শ্রোতা নেই। কিন্তু আতিয়া যদি মাইন্ড করে? কিছুদিন এরকম দেখা-সাক্ষাতের পর বলি, 'ইটস্ ভেরি নাইস অফ ইউ, আমাকে তোলবার জন্য ওয়েট করেন। কিন্তু আমি ডিপেন্ডেন্ট হতে চাই না। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।'

সময় কাটে, নীলের ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। এম এ-তে ভর্তি হয়েছে। এখন ব্যস্ত বাইরে যাবার সব টেস্ট নিয়ে। জি-আর-ই, জি-ম্যাট আরও কত কী! যাক, একটা ভাল ইউনিভার্সিটিতে পেয়েও যায়। তার যাত্রার প্রস্তুতিতে আমিও ননদের সঙ্গে শামিল, যদিও আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না নীল ইউ এস এ-তে যায়। আজকাল বিদেশে যাওয়া পার্মানেন্ট, এখানে বাইরের ডিগ্রির বিশেষ দাম নেই। যত স্নেহই করি না কেন, পরের ছেলে। হাসিমুখে বিদায় দিতে হয়।

যাতায়াতের পথে একদিন আতিয়াকে বলি, 'আমাদের আড্ডা কতকাল হয় না। এস একদিন।' আতিয়া জানায় সে ব্যস্ত, আরিফ তো গ্র্যাজুয়েশান করে আই টি-র একটা কোর্স শেষ করেছে। এখন কানাডা যাচ্ছে। ওখানে আতিয়ার সেজোদাদা থাকেন, তিনি স্পনসর, একটা কাজ কি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশান, কিছু একটা হয়ে যাবে। পাসপোর্ট ভিসা টিকিট সব কিছুরই ব্যবস্থা আতিয়াকেই করতে হচ্ছে।

'কেন? মিস্টার ত্রিবেদী করছেন না?'

'উনি প্যাসেজের টাকা দিয়েই খালাস। বাকি সব কাজ আমার। আসলে ওঁর শরীরটা কিছুদিন ধরেই ভাল নেই, সর্বদা কাশি। আর টায়ার্ডনেস। ডাক্তার দেখাবেন না, স্মোকিং কমাবেন না। কারখানা নিয়ে সারাক্ষণ টেনশান। কী করব বল?'

সান্ত্বনা দিই, ছেলে যাচ্ছে কানাডায়, দাঁড়িয়ে যাবে, আর চিন্তা কী? মেয়েরও তো দেখতে দেখতে গ্র্যাজুয়েশান শেষ। কী করছে? লোকাল একটা ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউটে ভর্তি হয়েছে। দিল্লিতে বড়দার ছোট মেয়ের বিয়েতে গিয়ে বৌদির জোরাজুরিতে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে আসি। দিন যায়।

অভ্যাসমতো লক্ষ্মীদির রোজনামচা শুনছি, তার শরীরগতিক, ঠিকে কাজের মেয়ে শেফালির কীর্তি, পাড়ায় কোথায় কী হল। 'জান, তলার বাবু কারবার টারবার বেচে দিয়ে সারাক্ষণ বাড়িতে? আজকাল চব্বিশ ঘণ্টা নিজের ঘরে থাকেন, উনি তো সেই বাড়িতে ঢোকা থেকেই বউয়ের থেকে আলাদা। আজ শেফালি বলছিল বাবু নাকি নিজের মনে কী সব বিড়বিড় করে পড়েন, মোটা একখানা বই থেকে। খুব যত্ন করে ওটা রাখেন। কেউ ঘরে ঢুকলেই ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দেন।'

'কী আর পড়বেন, নিশ্চয় কোরান।'

'না, শেফালি বলে, বাবু নাকি সুর করে পড়েন, হনুমান চালিশার মতো।'

দূর! ওসব ছোঁবেনই না একজন বিজ্ঞানের ছাত্র অবসরপ্রাপ্ত শিল্পপতি। মুসলমান না হলেও। যত্ত সব লোয়ার ক্লাসমার্কা গুজব। এরা সর্বদা ধর্মের গন্ধ পায়।

আতিয়ার আজকাল একেবারেই দেখা মেলে না। বাড়তি একটা রাতদিনের মেয়ে রেখেছে, সেলিনা। সেই দরজা খোলেটোলে। সময় কাটে। একদিন সন্ধ্যায় হাজির আতিয়া। 'সায়রার বিয়ে।' কার সঙ্গে, ছেলে কী করে? ওরা ক্লাসমেট ছিল, ছেলের পৈতৃক বিজনেস ট্যানারি। তিলজলায় বাড়ি। ওরিজিন্যালি বিহারের, একটু কনজারভেটিভ। তার আব্বু একদম হ্যাপি নন। যাই হোক মেয়ের পসন্দ, আমাদের দায়িত্ব শেষ।

ত্রিবেদীকে দেখলাম বিয়ের রিসেপশানে। একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গেছেন, নিষ্প্রভ মুখের চেহারা, খুব চুপচাপ। কে বলবে ক'বছর আগেও এত সপ্রতিভ মিশুকে একটা মানুষ ছিলেন।

একদিন কোচিং থেকে ফিরে শুনি একতলায় অ্যামবুলেন্স এসেছিল। ত্রিবেদীকে নিয়ে গেছে নার্সিংহোমে, আতিয়া সঙ্গে। খবর পেয়ে মেয়ে গেছে। কী হয়েছিল? দুদিন কিচ্ছু খাননি।

আগেই শুনেছিলাম ত্রিবেদী নিজের বিছানাতেই বেশিরভাগ সময় থাকেন, খাওয়া-দাওয়াতে ঝামেলা করেন। অবাক হয়েছি, ডাক্তার ডাকেনি কেন? কে জানে! নাক গলাতে যাই না। কিন্তু এখন তো বসে থাকা যায় না। খোঁজ নিই। মা মেয়ে

দুজনেই নার্সিংহোমে। পালা করে বাড়ি আসে স্নান খাওয়া করতে। কয়েকদিন পরে সায়রাকে ধরতে পারি। কী বলছেন ডাক্তাররা? সায়রা কেঁদে ফেলে, 'লাঙ ক্যানসার', — আমি বাধা দিয়ে বলি, 'আজকাল অনেক চিকিৎসা বেরিয়েছে, সার্জারি কেমোথেরাপি করে ভালো হয়ে যায়।'

মাথা নাড়ে মেয়েটি, 'টারমিনাল স্টেজ, কিচ্ছু করার নেই। আই সি ইউতে আছেন। আরিফকে খবর দেওয়া হয়েছে। কাল পৌঁছাবে।'

পৌঁছায়। দিন যায়। শুনি অবস্থা ক্রমেই আরও খারাপ হচ্ছে। ডাক্তার ভেন্টিলেশানে দিতে চেয়েছিল, ত্রিবেদী নাকি অ্যাডমিশানের সময় বলে দিয়েছিলেন ভেন্টিলেশানে যেন না দেওয়া হয়। এখন তখন অবস্থা। ভিজিটিং আওয়ারে আই সি ইউতে যাই। মেশিন পরিবৃত সর্বাঙ্গে নল, মিস্টার ত্রিবেদী বিছানার সঙ্গে মিশে গেছেন। চোখ বন্ধ। আরও খারাপ অবস্থা। আবার যাই। নির্বাক মুমূর্ষু মানুষটি। স্ত্রী-ছেলেমেয়ে দুদিকে হাত ধরে আছে। হঠাৎ চোখ খুললেন। স্থিরদৃষ্টি। আমি ঝুঁকে বলি, 'কিছু বলবেন?' ঠোঁট নড়ছে, কোনো আওয়াজ নেই। আবার বলি, 'বলুন না কী বলবেন।'

প্রাণপণ চেষ্টায় মৃদু স্বর শোনা গেল, আমি কানটা ওঁর মুখের কাছে নিই। মৃত্যুপথযাত্রীর অস্ফুট কণ্ঠ, 'রাম রাম রাম রাম'... বলতে বলতে বুকটা হাপরের মতো ওঠে নামে। ঘড়ঘড় শব্দ। আস্তে আস্তে শেষ।

ওদের আত্মীয়স্বজন আসা পর্যন্ত সঙ্গে থাকি। ইরফান রহমানের শেষযাত্রায় আমি শান্তা চৌধুরী কী করব। পরদিন শুনি, শেফালি তলার সেলিনাকে তারস্বরে জিজ্ঞাসা করছে, 'শেষ পর্যন্ত কী হল রে? গোর দিল না পোড়াল?' এ আবার কী অসভ্যতা, কষে ধমক লাগাই। লক্ষ্মীদির কাছে শুনি ত্রিবেদীকে গতকাল যথাবিহিত আচার অনুষ্ঠান করে কবরস্থানে নিয়ে গেলে তাঁকে কবর দিতে কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করে। মুসলমান হিসেবে তাঁর নাম নথিভুক্ত নয়। অতঃপর আলোচনা, তাঁকে অন্য কোনোভাবে সমাধি দেওয়া হবে, না শ্মশানে নিয়ে হিন্দুমতে দাহ করা হবে। শেষমেষ দীননাথ ত্রিবেদী / ইরফান রহমানের কী হল কেউ সঠিক জানে না।

আতিয়ার চোখে কেউ এককোঁটা জল দেখেনি। সব করণীয়কর্ম যথাবিধি সম্পন্ন করেছে। একতলা ভরতি হয়ে গেল লম্বা কামিজ খাটো পাজামা দাড়িতক্কি আর বোরখায়।

সব বিদেয় হলে একদিন আতিয়ার কাছে বসি। 'আমি তো যথাসাধ্য কেয়ার নিয়েছিলাম। আই ডিড মাই বেস্ট। তবু কেন এমন হল?'

'ওঁর বয়স হয়েছিল। তোমার চেয়ে তো অনেকটাই বড় ছিলেন।' মামুলি স্তোকবাক্য উচ্চারণ করি।

মাস ছয়েক পর একদিন সকালে শুনি আতিয়া ঘুম থেকে উঠছে না। তাড়াতাড়ি নিচে যাই, সায়রাকে খবর দেওয়া হয়। সেলিনা জানায় আগের দিন ত্রিবেদীর ঘরে ঢুকেছিল আতিয়া জিনিসপত্র গোছগাছ করতে। মারা যাওয়ার পর প্রথমবার। টেবিলের কাগজপত্র বইটই সরিয়ে ড্রয়ার খুলে দেখে মোটা বইটা। সেলিনা বলে, 'এটাইতো বাবু সর্বক্ষণ পড়তেন।' বইটা খুলে আতিয়ার মুখ কেমন হয়ে যায়। থম হয়ে বসে থাকে, রাতে খায়নি। সকালে ডাকতে সাড়া নেই।' বইটা হাতে নিই। ব্রাউন পেপারের মলাট খুলি, সামনে জ্বলজ্বল করে নাম— রামচরিতমানস।

মাসিভ স্ট্রোকে শয্যাশায়ী বাক্যহীন আতিয়া। একটা দিক পুরো প্যারালাইজড, ক'বার দেখে এসেছি। কতদিন লাগবে সারতে, আদৌ পুরো সেরে উঠবে কিনা কেউ জানে না। আরিফের পক্ষে কানাডায় নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সায়রা তার শ্বশুরবাড়িতেই নিয়ে রাখবে আম্মিকে। তলায় লোকজনের আনাগোনা, জিনিসপত্র সরাবার আওয়াজ। বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। এক সন্ধ্যায় সায়রা আসে দেখা করতে, 'আন্টি বাড়ি লক করে দিলাম।'

আল্লাহু আকবর। সন্ধ্যার আজান। বিশ্বাসীদের প্রতি আহ্বান। রাস্তার দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিই।

Autoply Harness Industries

Commerce House (1st Floor, Room No. 3-A)

Manufacturers of

Autoply® BRAND

Automobile Wiring Harness,
PVC Auto Cable, Battery Cable, PVC Tape,
Wiring Terminal
and Auto parts

2, Ganesh Chandra Avenue
Kolkata - 700 013

Phone : 2213-2971, 2213-2907

Durga Puja Festival Greetings
to
All Our Customers, Patrons
and Well Wishers.

MAZZA DENIM

Incense Sticks

Now you can capture the beauty of an experience light-up and unfold a thousand petals.

Shashi Industries

Bhabnagar - 364 001
Bangalore - 560 010

DURGA TRADING CO.

40, Strand Road, Fourth Floor, Room No.4,

Kolkata - 700 001

Phone : 2243 1722 / 1447, Fax No. 033 2243 3922

E-mail : aksadt_saboo@yahoo.co.in

Leading Raw Meterial Supplier to Paper Mills :

Bamboo, Hardwood, Bamboo Chips and other Raw Materials for Paper Mills.

Pan No. AACHA0716 M

বিশ্বের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর

অমলেশ মিশ্র

পুণ্যশ্লোকপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর সদাকর্মব্যস্ত ছাত্রজীবনে, কর্মজীবনে ও সামাজিক জীবনে যে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন এবং এই কর্মোদ্যমের পিছনে যে নিজত্ব, পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব ছিল তার সমকক্ষ সারা বিশ্বে আর কাউকে পাই না। স্বীকার করি যে, আমার জ্ঞান বেশ সীমিত এবং আমার বিশ্লেষণী দৃষ্টি অন্য অনেকের থেকে হয়তো কম। আমার এই বক্তব্যের মধ্যে আমি বিশ্বের অন্য কারোর প্রতিভা অস্বীকার করছি না বা নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁদের অসামান্য কীর্তির বিষয়েও প্রশ্ন তুলছি না। সে অধিকার বা যোগ্যতা আমার আছে বলে আমি মনেও করি না।

তবে মনে হয়েছে, তাঁদের প্রতিভা ছিল একমুখী। অপরদিকে বিদ্যাসাগরের প্রতিভা বহুমুখী এবং অনেক বেশি ব্যাপ্ত। আমরা বিদ্যাসাগর রামমোহনকে বিশ্বের প্রেক্ষিতে কখনও বিশ্লেষণ করিনি। যদি করা হয়, তবে আমার মনে হয়, আমি বিদ্যাসাগর নিয়ে সামান্য অত্যুক্তিও করছি না যে তাঁর মতো মানুষ আমি পাইনি।

এই প্রসঙ্গে আমি বিদ্যাসাগরের যুগের (ঊনবিংশ শতাব্দী) বেশ কিছু প্রতিভার উল্লেখ করছি। তাঁদের প্রতিভা বিশ্বে চমৎকার ও বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাঁদের অনেকেরই মানসিকতার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মানসিকতার আকাশ-পাতাল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবুও তাঁরা বিশ্বখ্যাত হয়েছেন, রামমোহন ও বিদ্যাসাগর বিশ্বখ্যাত হননি। এর মূলে রয়েছে মূল্যায়ন প্রণালী। প্রাচ্য মূল্যায়ন প্রণালী ও পাশ্চাত্য মূল্যায়ন প্রণালী পৃথক। পাশ্চাত্য মূল্যায়নের ভিত্তি হল অভিকরণ প্রদর্শনী। প্রাচ্য মূল্যায়ন প্রণালীর ভিত্তি হল অভ্যন্তরীণ গুণাবলী, যা প্রধানত মানবিক ও অভিকরণ প্রদর্শনী।

পাশ্চাত্য প্রণালীতে অভিকরণ প্রদর্শনী (পারফরমেন্স) চোখধাঁধানো হলেই হল। তার অভ্যন্তরীণ গুণাবলী কতটা মানবিক বা মানবিক নয়, তার বিচার অপ্রয়োজনীয়। প্রাচ্য প্রণালীতে ব্যাপারটা সে রকম নয়। বিদ্যাসাগরের অভিকরণ প্রদর্শনী ভারতের প্রেক্ষিতে যথেষ্ট চোখধাঁধানো হলেও বিশ্বের প্রেক্ষিতে ততটা ছিল না। যদিও তাঁর অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর ধারেকাছে আর কেউ ছিলেন না।

আর বিশ্বখ্যাতির যাঁরা মূল্যায়ন করেন তাঁরা সকলেই পাশ্চাত্য চিন্তনপ্রণালীর ও পাশ্চাত্য মূল্যায়ন প্রণালীর মানুষ।

আমাদের (ভারতীয়দের) শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে আমরাও (ভারতীয়রাও) পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালী ও মূল্যায়নে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমরা শুধু অভিকরণ প্রদর্শনী দেখি, অভ্যন্তরীণ গুণাবলী দেখি না। তাই বিদ্যাসাগরকে আমরা কেবল বাংলার প্রেক্ষিতে বিচার করি, বিশ্বের প্রেক্ষিতে করি না।

আমি যে কয়জনের নাম উল্লেখ করছি, তাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীরই। তবে কারোর কারোর কার্যকাল বিংশ শতাব্দীতেও বিস্তৃত ছিল। আবার রামমোহন রায়, যাঁর জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীতে হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিনি এক জ্যোতিষ্ক স্বরূপ ছিলেন। রামমোহন সম্পর্কে সবিশেষ বিস্তৃত পৃথক আলোচনা প্রয়োজন। তাই এই নিবন্ধে তাঁকে জড়ালাম না।

আমি এই প্রবন্ধে যাঁদের প্রসঙ্গ তুলেছি তাঁরা হলেন— নেপোলিয়ান বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১), ইতালিতে জন্ম। ফ্রান্সের সম্রাট হয়েছিলেন (১৮০৪-১৫)। ম্যৎসিনি (১৮০৫-১৮৭২), জন্ম ইতালিতে। গ্যারিবল্ডি (১৮০৭-১৮৮২), ইতালি। চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২), ইংল্যান্ড। আব্রাহাম লিঙ্কন (১৮০৯-১৮৬৫), জন্ম আমেরিকায়, আমেরিকার রাষ্ট্রপতিও হয়েছিলেন। বিসমার্ক (১৮১৫-১৮৯৮), প্রাশিয়া, জার্মানি। জার্মানির চ্যান্সেলার ছিলেন ১৯ বছর। কার্ল মার্কস (১৮১৫-১৮৮৩), প্রাশিয়া, জার্মানি। হার্বার্ট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩), ইংল্যান্ড। লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০), রাশিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬), ভারতবর্ষ। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), ভারতবর্ষ। মোপাসাঁ (১৮৫০-১৮৯০), ফ্রান্স। বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৬১-১৯২০), ভারতবর্ষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), ভারতবর্ষ। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২), ভারতবর্ষ। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮), ভারতবর্ষ। ভি আই লেনিন (১৮৭০-১৯২৪), রাশিয়া। শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০), ভারতবর্ষ। সমারসেট মম (১৮৭৪-১৯৫০), ফ্রান্স। টমাস ম্যান (১৮৭৫-১৯৫৫), জার্মানি। মাও-সে-তুঙ (১৮৯৩-১৯৭৬), চীন। সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭— ?), ভারতবর্ষ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সহ ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ২২ জনের নাম দিলাম এঁদের প্রত্যেকেই বিশ্বে স্বনামখ্যাত। কেউ সামরিক ক্ষেত্রে, কেউ রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে, কেউ দার্শনিক, কেউ সাহিত্যিক, কেউ ধর্মপ্রবক্তা, কেউ বা বিপ্লবী, কেউ বা রাজা, কেউ সন্ন্যাসী।

ঈশ্বরচন্দ্র রাজা ছিলেন না, তবে রাজার থেকে বেশি বিত্তশালী ছিলেন। রাজারা যা করেননি, এই মহাপুরুষ তাও করেছেন, অর্থাৎ ঋণ করেও দান করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র সন্ন্যাসী ছিলেন না তবে সন্ন্যাসীর থেকেও বেশি ত্যাগী ছিলেন। অথচ সন্ন্যাসীদের মতো উপদেশ দিতেন না, উপদেশ বিতরণের মাধ্যমে উপার্জনও করতেন না। ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক বলা যাবে না, তবে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে যা লাগে— সেই ভাষা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এবং তার ব্যবহার করে কিছু সাহিত্যকীর্তিও রেখে গেছেন। দক্ষ সমর বিজ্ঞানী ছিলেন না। ঢাল, তলোয়ার, কামান, বন্দুক নিয়ে লড়াই করেননি। সামরিক ক্ষেত্রে তাঁর অস্ত্র ছিল লেখনী। সমাজ সংস্কার সমরে তাঁর লেখনী যেমন আত্মরক্ষায় নিপুণ ছিল, আক্রমণেও সুনিপুণ। অন্যথায় তিনি পর্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করে এতগুলি যুদ্ধ প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় জয়যুক্ত হতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র কোনো প্রখ্যাত দার্শনিক ছিলেন না। তবে মনুষ্যত্বের উপলব্ধিকে যদি দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় তবে সগর্বে বলা যায় যে, তিনি পৃথিবীর একনম্বর দার্শনিক। মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের এত বড় উদাহরণ অন্যত্র এবং অন্যতে পাওয়া যায় না। তাঁর তত্ত্ব তিনি প্রকাশ করেছেন কর্মে। দারিদ্র্যের কারণ বর্ণনা করে কোনো ইস্তাহার প্রণয়ন করেননি আর লাইব্রেরি ঘরে আরামে বসে দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কার ও আলোচনায় তাঁর না ছিল সময়, না ছিল রুচি। দারিদ্র্যের কারণ তিনি জানতেন— তাই তা নিয়ে বেশি কচকচিতে না গিয়ে নিজের সাধ্যের মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ করেছেন। সেদিক থেকে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনই ঈশ্বরচন্দ্রের বাণী। এই বাণী দেওয়ার জন্য অতিপ্রিয় ইংরেজ পোশাক পরিত্যাগ করে খেড়ো ধুতি পরার নাটুকেপনা করতে হয়নি। যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি বা অর্থ কোনো কিছুর জন্যই কারুর তাঁবেদারি বা তোষণ করেননি। ঈশ্বরচন্দ্র ঈশ্বরসেবার ও ঈশ্বরপ্রাপ্তির কোনো মোরাম বা পিচ রাস্তা বানিয়ে দেননি। নিজে বুঝেছিলেন মানুষের সেবাই ঈশ্বরসেবা এবং মাতা ভগবতী দেবীর প্রদর্শিত পথেই আমৃত্যু সেই সেবা করেছেন। কোনো মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তার মাধ্যমে সেবা করার কল্পনা তাঁর মাথায় আসেনি এবং তা কল্পনা করার সময়ও তাঁর ছিল না। দিনের ২৪ ঘণ্টা যে-কয় মিনিটে হয়, তার প্রতিটিই তিনি ব্যবহার করেছেন মনুষ্যহিতে। মানুষ এবং মনুষ্যত্বের সেবা ছিল তাঁর স্বভাবধর্ম। মানুষ ও মনুষ্যত্বের অবমাননায় তিনি হঠাৎ বিচলিত হতেন না। সদাই সর্বদাই শয়নে, স্বপনে, জাগরণে দিনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি বিচরিত হতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা নিরসনে কাজে নেমে পড়তেন একলাই। হাঁকডাক করে লোক জোগাড়ের জন্যও সময় নষ্ট করতেন না।

ওই শতাব্দীর যে কয়েকজন বিশ্বখ্যাত ব্যক্তির নাম দিয়েছি, তাঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভাধর ছিলেন, কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁদের প্রতিভা একমুখী। কেউ সাহিত্যিক, কেউ দার্শনিক, কেউ কূটনীতিক, কেউ রাষ্ট্রশাসক, কেউ বিপ্লবী ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়— 'প্রতিভা মানুষের সমস্তটাই নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক— তাহা সর্বত্রব্যাপী এবং স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ, আর মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্তেই সকল কার্যে আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। প্রতিভা বিদ্যুতের ন্যায় আপনার আংশিকতা বশতঃই লোকচক্ষে তীব্ররূপে আঘাত করে এবং চরিত্র মাহাত্ম্য আপনার ব্যাপকতা গুণেই, প্রতিভা অপেক্ষা ম্লানতর মনে হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে সে বিষয় কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না।" (বিদ্যাসাগর স্মরণসভায় ১৩০২ সালের ১৩ শ্রাবণ পঠিত প্রবন্ধ)। আমার প্রতিপাদ্য বিষয়টি এই-ই যে, এদেশের রামমোহন এবং ঈশ্বরচন্দ্র একাধারে প্রতিভাধর এবং চরিত্র মাহাত্ম্যে বলীয়ান ছিলেন। এই দুই দিক একাধারে, অন্যদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। এই কারণেই এই দুই মহামানব বিশ্বের প্রতিভাধরদের তুলনায় অনেক বেশি আকর্ষণীয়, অনেক বেশি গ্রহণীয় এবং অনেক বেশি মহীয়ান।

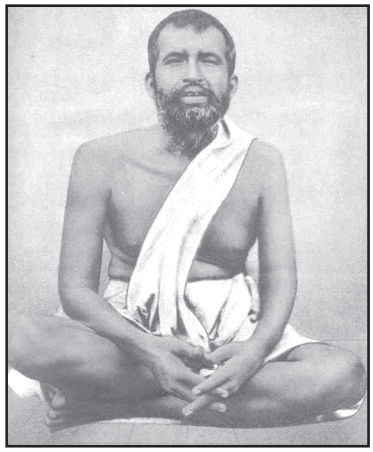

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

এই প্রবন্ধে রামমোহন আলোচ্য নন। আমরা আমাদের আলোচনা কেবলমাত্র বিদ্যাসাগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব।

সাহিত্যিক মুল্‌ক রাজ আনন্দ তাঁর 'আওয়ার হেরিটেজ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, এমন কোনো মনুষ্য চরিত্র নেই এবং এমন কোনো মনের ভাব নেই, যা ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যাবে না। সহজ কথায়, আমরা যত ধরনের মানুষ দেখেছি, যত ধরনের মানুষ কল্পনা করতে পারি এবং যত ধরনের মনের ভাব বিষয়ে জানি ও কল্পনা করতে পারি, অর্থাৎ মানুষ এবং মনের ভাবের যত বৈচিত্র্য সম্ভব, সবই সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যাবে। (পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষার সাহিত্য এত বিরাট বৈচিত্র্যযুক্ত কিনা আমার জানা নেই। তবে সংস্কৃত অতিশয় প্রাচীন ভাষা হওয়ার কারণে এবং সাহিত্যচর্চাও বহুকালের পুরনো বলেই সংস্কৃত সাহিত্য অধিকতর সম্পদশালী হয়েছে, অনেক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়েছে, যা অন্য ভাষাগুলির ক্ষেত্রে ঘটেনি।) সেই সংস্কৃত সাহিত্যের এক মহাকবির ব্যাখ্যায় পূর্ণ মনুষ্যত্বের মধ্যে দুটি গুণ থাকে— (১) বজ্রের মতো কঠোরতা আর (২) কুসুমের মতো কোমলতা।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের জীবনী ও চরিত্র রচনাকার সকলেই বলেছেন যে, মহাকবি কথিত পূর্ণ মনুষ্যত্বের ওই দুইটি গুণই বিদ্যাসাগরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বহুবারই পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, অন্যত্র যে সব ঘটনায় ঢক্কানিনাদ হয়, এদেশে তার অধিকাংশই নীরবে সম্পাদিত হয়। এদেশে ইতিপূর্বে এমনকী বিদ্যাসাগরের যুগেও, মৌমাছিরা ফুলের গন্ধে আমোদিত হয়ে খুঁজে খুঁজে ফুলের কাছে গিয়ে পৌঁছাত। এখন তো উলটপুরাণ— ফুলেরাই মৌমাছির খোঁজ করছে নিজের গন্ধ শোঁকাবে বলে।

বিশ্বের প্রেক্ষিতে ঈশ্বরচন্দ্রের আলোচনা করতে গেলে সেই সময়কার বিভিন্ন দেশের কিছু মানুষের নাম এসেই যায়। সেই সব মানুষের তুলনায় ঈশ্বরচন্দ্রের গুণমান এবং খ্যাতি কেমন ছিল, সেটাই বিবেচ্য। এটা তো আমরা জেনেই গেছি যে, ঈশ্বরচন্দ্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন না। যে প্রচার বা ঢক্কানিনাদ ওই খ্যাতি এনে দেয়, সেই প্রচার ঈশ্বরচন্দ্র পাননি। আমার তো আরও মনে হয়, তাঁর চরিত্রমাহাত্ম্য বিচার করার মতো গুণমানের মানুষই বা কোথায় ছিলেন?

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কিছু খ্যাতিমান ব্যক্তির নাম এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করেছি, যাঁরা অন্যান্য দেশের হলেও বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক। বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ সালে, প্রয়াণ ১৮৯১ সালে। রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩) যেমন বিদ্যাসাগরের পূর্বে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর প্রয়াণকালে বিদ্যাসাগরের বয়স ১৩ বছর।

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

বেনারসী, সিল্ক, তাঁত শড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রিয় গোপাল বিষয়ী ®

স্থাপিত - ১৮৬২

বড়বাজার ঃ ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা - ৭,

ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৪০২, ২২৬৮-২৮৩৩

২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭, ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৫০৮

গড়িয়াহাট ঃ ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে,

কোলকাতা - ৭০০ ০২৯, ফোন ঃ ২৪৬৫-৮২৪৬

এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ১৭৬৯ সালে (রামমোহনের ৩ বছর আগে) জন্মগ্রহণ করলেও মৃত্যু হয় ১৮২১ অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন মাত্র ১ বছর।

নেপোলিয়ান বিখ্যাত হয়েছেন তাঁর সামরিক প্রতিভার কারণে। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর সমস্ত কর্মপ্রেরণার মূলতত্ত্ব। মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় তাঁর চরিত্রে বিরল। অপরদিকে বিদ্যাসাগরের প্রধান সম্পদ ছিল অক্ষয় মনুষ্যত্ব। তাই নেপোলিয়ন যে কারণে বিখ্যাত সে কারণকে কোনো মহান কারণ অবশ্যই বলা যায় না। নেপোলিয়ন তাঁর প্রতিভা ব্যবহার করেছেন নিজের জন্য আর ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রতিভা ব্যয় করেছেন অপরের জন্য। তবে তেজ এবং দৃঢ়তায় দুজনেই ছিলেন অনমনীয়। আর নেপোলিয়নের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের মিল পাওয়া যায় মাতৃভক্তির বিষয়ে। মাতা ভগবতীদেবীর প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের এতই ভক্তি ছিল যে, তিনি অন্য কোনো দেবী প্রতিমার প্রয়োজন তাঁর নিজের জীবনে অনুভব করেননি। নেপোলিয়ানও চূড়ান্ত মাতৃভক্ত ছিলেন।

ইটালির দুই বিপ্লবী ও রাজনীতিক যাঁরা ছিন্নভিন্ন ইটালিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন তাদের একজন ম্যাৎসিনি (১৮০৫-১৮৭২) এবং অপরজন গ্যারিবল্ডি (১৮০৭-১৮৮২)। দুজনেরই জন্ম ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বে, তবু একই শতাব্দী। এই দুই ইতালীয় মাতৃভূমির প্রতি অখণ্ড প্রেমবশত বিপ্লবী দল (কারবোনারি) গঠন করেছেন, প্রভূত রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করেছেন, দেশের মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। স্বাধীনতাকামী মানুষেরা প্রেরণা লাভের উদ্দেশ্যে ম্যাৎসিনীর বক্তৃতা পড়তেন, কারবোনারি ধরনের বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করতেন। ভারতের বিপ্লবীরা ম্যাৎসিনির কাছে ঋণী। এঁরা দুজনেই স্বদেশপ্রেমী রাজনীতিক যাঁরা তাঁদের কাজে সফল হয়েছিলেন। বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রেমীরা শ্রদ্ধায় এঁদের নাম স্মরণ করেন। এঁরা নিজ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র রাজনীতির লোক ছিলেন না। তখন ভারতবর্ষে কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপও ভারতীয়রা শুরু করেননি। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের ৩৭ বছর পরে ইংরাজদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ মহাযুদ্ধ হয়। ভারতের শাসনভার সরাসরি বৃটিশ সম্রাটদের হাতে চলে যায়। মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ভীত ইংরাজ শাসকরা তখন ভারতকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার জন্য ঘুঁটি সাজাচ্ছেন।

বিদ্যাসাগরের যুগে আমরা দেখতে পাই পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় দুটি সংস্কৃতি খুব কাছাকাছি আসতে শুরু করেছে। রামমোহন রায় এই সময়কালে তাঁর মূল্যবান অবদানগুলি রেখে গেছেন। দুটি সংস্কৃতির সংঘাতের ফলে যে নতুন ভাবধারাটি অঙ্কুরিত হয়েছিল, তাকে রূপায়িত করার কাজটি নিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। তাঁর শিক্ষাসংস্কার ও সমাজ সংস্কারের অতি বৃহৎ ও কঠিন কাজগুলি সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, ছিল দেশ গঠনের ও দেশপ্রেমের আন্দোলন। তাঁর পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে মাতৃভূমির কথা বলেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেভাবে কখনও বলেননি।

বিদ্যাসাগরের যুগে আর এক খ্যাতিমান ব্যক্তি চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২)। ইংল্যান্ডে জন্ম। ১৮৫৯ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তকটি 'অন দি অরিজিন অফ স্পিসিস বাই মিন্‌স অফ ন্যাচারাল সিলেকশন' প্রকাশ করেন। ১৮৩১-১৮৩৬— পাঁচ বছর তিনি দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ সমুদ্রে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রকৃতিবাদী রূপে একটি অভিযানে যান। এই পাঁচ বছরে তিনি তাঁর তত্ত্ব প্রস্তুত করেন, যা একটি অনুমান মাত্র, যদিও বহুল পরিচিত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এইসব তত্ত্ব আলোচিত হয়।

গুণমান বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে ডারউইনকে এক পংক্তিতে আনা যায় না। তবু তিনি ইংরেজ এবং অপরীক্ষিত একটি অনুমানকে তত্ত্ব হিসাবে চালিয়ে দেওয়ার যে গৌরব তাঁর প্রাপ্য তা তিনি পেয়েছেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের গুণাবলীর যে প্রসঙ্গে আমরা আসব, সেগুলির সঙ্গে চার্লস ডারউইন অপ্রাসঙ্গিক। তবু তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। আর ঈশ্বরচন্দ্রকে বিশ্ব চেনেই না। এই সময়ে ১৮০৯ সালে এক পৃথিবী বিখ্যাত ব্যক্তি আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেন। আততায়ীর হাতে মৃত্যু হয় ১৮৬৫ সালে। তিনি আমেরিকার একদা রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলেছেন— "The man to whom I have appealed has the giniuu and wisdom of an ancient sage, the energy of an English man and the heart of a Bengali Mother"। বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'আমি যাঁর কাছে আবেদন করেছি, তাঁর প্রতিভা ও বৈদগ্ধ্য প্রাচীন ঋষিদের মতো, কর্মোদ্যম ইংরেজের মতো এবং হৃদয়বত্তা বাঙালি জননীর মতো'। মাইকেল বিদেশে থাকতে গভীর আর্থিক সমস্যায় পড়ে বিদ্যাসাগরের সাহায্য চেয়েছিলেন। মাইকেলের কথাগুলি সেই সূত্রে।

প্রথম কথাটিই ধরা যাক, 'প্রতিভা ও বৈদগ্ধ্য প্রাচীন ঋষিদের মতো।' আমার জিজ্ঞাস্য হল, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে কি প্রাচীন ঋষি বা ঋষিরা ছিলেন, যাঁর বা যাঁদের কাছ থেকে সেসব দেশের বিরাট ব্যক্তিরা সামান্যও ঋদ্ধ হতে

পারতেন?

ঈশ্বরচন্দ্রের মেধা ও জ্ঞানভাণ্ডার কিংবদন্তীর মতো। এরকম দ্বিতীয় উদাহরণ সংগ্রহ কষ্টসাধ্য, হয়ত অসম্ভব। আর ঈশ্বরচন্দ্রের ওই বৈশিষ্ট্য কেবল এক শতাব্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডার ও মেধা অবশ্যই গগনচুম্বী, কিন্তু বিদ্যাসাগরের সমতুল কিনা বিনা গবেষণায় নির্ণয় করা অসম্ভব।

মাইকেলের বিদ্যাসাগর মূল্যায়ন নিয়ে গভীর আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমসাময়িক আরও কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির কথা আলোচনা করব।

আমরা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের (১৮০৯-১৮৬৫) উল্লেখ করেছি। আততায়ীর হাতে তাঁর অকালমৃত্যু হয়। তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ রাষ্ট্রপতি (১৮৬১-১৮৬৫)। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্ণয় করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যত্নবান ছিলেন। তাঁর সাধারণ জ্ঞান ও সততা ছিল উচ্চমানের। তিনি দাসপ্রথার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কৃষ্ণাঙ্গদের কখনও শ্বেতাঙ্গদের সমকক্ষ মনে করতেন না, সমান সুযোগ দানেরও পক্ষপাতী ছিলেন না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে সাতটি রাজ্য ছিল দাসপ্রথার সমর্থক। লিঙ্কন ১৮৬০ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়যুক্ত হওয়ার পর ওই সাতটি রাজ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল। ফলে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ বাধে। লিঙ্কন এই গৃহযুদ্ধে জয়ী হলেন। সংবিধানের ১৩তম সংশোধনে দাসব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হল।

লিঙ্কন দৃঢ়চেতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কূটকৌশলী ছিলেন ঠিকই। দাসব্যবস্থা অবলুপ্ত করা সেই দেশের পক্ষে একটি অসম সাহসিক কাজ। এদেশে বিধবা বিবাহ চালু করার মতো। কিন্তু একথা তো স্পষ্ট যে তিনি মননজীবী ছিলেন না এবং 'সিঙ্গেল হ্যান্ডেড ফাইট' বলতে যা বোঝায় তা তাঁকে করতে হয়নি, তবে নেতৃত্ব দিয়েছেন যথেষ্ট ভাল । বলা যায় অসাধারণ।

বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্বের কথা বলেছেন— লিঙ্কনের চরিত্রে তার আভাস ইঙ্গিত কতটা পাওয়া যায় এবং প্রাচীন ঋষিদের মতো প্রতিভা ও বৈদগ্ধ কতটা পাওয়া যায়, পাঠকরা বিচার করবেন। রামেন্দ্রসুন্দর কি যথার্থই বলেছেন যে, বিদ্যাসাগর জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট করে দেখায়?

এই প্রসঙ্গে বিশ্বের আর এক সুবিখ্যাত রাষ্ট্রনেতা— এডওয়ার্ড লিওপোল্ড ভন বিসমার্ক-য়ের কথায় আসা যাক। বিসমার্ক (১৮১৫-১৮৯৮) প্রাশিয়া অর্থাৎ জার্মানির মানুষ। ১৮৭১ সালে ফ্র্যাংকো প্রাশান যুদ্ধের পর তিনি জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করেন— জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি সুদীর্ঘ ১৯ বছর চ্যান্সেলার হয়ে জার্মানি শাসন করেছেন। কিন্তু তিনি জার্মানির অভ্যন্তরীণ ঐক্য স্থাপন করতে পারেননি, যদিও লৌহমানব রূপে খ্যাত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ২০ বছর পরেই জার্মান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। লৌহমানব বিসমার্কের ভিতর এবং বাহির দুটোই ছিল লৌহ। আর বিদ্যাসাগরের বাইরেটা ছিল লৌহ আর ভিতরটা ছিল পুষ্প। বিসমার্কের মনুষ্যত্বে কোনো অবদানের কথা শোনা যায় না। আর তাঁর রাজনৈতিক জয়ও স্থায়িত্ব পায়নি।

ঈশ্বরচন্দ্রের বড় অসুবিধা যে তিনি বাঙালি। তখনকার বাংলা আয়তনে এবং লোকসংখ্যায় ইউরোপীয় অনেক দেশের থেকে বড় ছিল। কিন্তু বাংলা কোনো পৃথক রাষ্ট্র নয়, আগেও ছিল না, এখনও নয়। তাই আন্তর্জাতিক মাঠে ভারতের নাম আসে, বাংলার আসে না। বহুবিভক্ত ইউরোপে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা বা ইটালিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ অতিশয় কঠিন রাজনৈতিক কাজ। এর জন্য যুদ্ধবিগ্রহ করতে হয়েছিল। এই সব রাজনৈতিক হাঙ্গামার জগতে ঈশ্বরচন্দ্র মানানসই নাম নয়। মনে রাখতে হবে যে, ওই জগৎ মননশীলতার থেকেও বেশি পরিচালিত হয় পেশীবল ও অর্থবলে— আগেও হত, এখনও হয়।

এই সময়কালের আর এক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির নাম এসে যায়। এই সেদিন পর্যন্তও খুব আড়ম্বরের সঙ্গে এই নামটি আলোচিত হত। আমি কার্ল মার্কসের (১৮০৮-১৮৮৩) কথা বলছি। জাতিতে জার্মান (প্রাশিয়া) কিন্তু জীবন কেটেছে ইংল্যান্ডে বসে। বন এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্র মার্কসবাদের উদ্‌গাতা। একটি নতুন মতবাদ যা পৃথিবীকে চমকে দিল, শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব, শ্রমিকদের হাতে রাষ্ট্রশাসন ভার পাওয়ার তত্ত্ব, বিপ্লবের তত্ত্ব, ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশ। প্যারিসে আলাপ হয় ফ্রেডরিক এঙ্গেল্‌স-য়ের সঙ্গে, তাঁর সারা জীবনের সঙ্গী। এই মার্কসবাদের ভিত্তিতে রাশিয়া, চীনসহ ইউরোপের বহু রাজ্যেরই রাজনৈতিক চরিত্র পাল্টেছে। ১৯১৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত এই রাজনৈতিক মতবাদের রমরমা পৃথিবী লক্ষ্য করেছে। 'মার্কসবাদ দীর্ঘজীবী হোক' — এই ধ্বনিতে বহু দেশ মুখরিত হয়েছে। বিপ্লব, সংঘর্ষ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক পথ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সম্ভবত প্রকৃতির নিয়ম ও মানবিক নিয়মের সঙ্গে অসামঞ্জস্যতা হেতু ১৯৯০ সালের পর মার্কসবাদের চমক স্তব্ধ হয়ে গেছে। এখনও কোথাও কোথাও মার্কসবাদের নামে রাজনৈতিক দল থাকলেও শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব এখন মানুষকে আর আকর্ষণ করে না।

ঈশ্বরচন্দ্র কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন না। কোনো তত্ত্ব তিনি আমাদের দেননি। তিনি ছিলেন আদর্শ মানুষ, তাঁর জীবনই তাঁর তত্ত্ব, তাঁর বাণী। তাঁর তত্ত্ব বা বাণীর কোনো ক্ষয় নেই, কোনো ব্যয় নেই, কোনো প্রচার নেই। তা উপলব্ধি ও অনুসরণের জন্য। তাঁর সমাজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনে সমন্বয় সাধনই লক্ষ্য ছিল— রক্তাক্ত বিপ্লব নয়।

সেই যুগের কিছু খ্যাতনামা ভারতবর্ষীয়ের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের আলোচনায় আসার আগে আর একজন বিশ্বখ্যাত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি হলেন হার্বার্ট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩)। ইংল্যান্ডের মানুষ। সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক হিসাবে স্পেনসার খ্যাত। ১৮৫৫ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে ৯ খণ্ডে লিখেছেন System of Synthetic Philosophy। চার্লস ডারউইনের মতবাদের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। স্পেনসারও বলতেন Survival of the Fittest— অর্থাৎ যোগ্যতমেরই বাঁচার অধিকার আছে। ডারউইনের তত্ত্ব ছিল জীবকেন্দ্রিক আর স্পেনসার করলেন সমাজকেন্দ্রিক। তাঁর তত্ত্বে খোলা বাজার অর্থনীতিতে Free Market System ও Laissez Faire (লাসাফেয়ার তত্ত্ব) ব্যবস্থায়, সরকারের হস্তক্ষেপ থাকবে না— ফলে যা দুর্বল এবং অযোগ্য তা বাতিল হয়ে যাবে, থাকবে শুধু যোগ্যরা। পৃথিবী হবে বীরভোগ্যা।

এই তত্ত্বটি মার্কসীয় তত্ত্বের মতো। বিদ্যাসাগরের সমকালীন হলেও তাঁর এসব দিকে নজর দেওয়ার আর তত্ত্ব খাড়া করার কোনো নেশা পেয়ে বসেনি। কলকাতা থেকে কালনা প্রায় ৩০-৩৫ মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে এবং এসে যে ব্যক্তি তাঁর বন্ধুর চাকুরির ব্যবস্থা করেন, তাঁর কাছে এসব তত্ত্ব কাগজমাত্র— এগুলি কোনো মানবিক প্রয়োজন বলে সম্ভবত তাঁর মনেই হয়নি। প্রতিভা ও বৈদগ্ধে যিনি প্রাচীন ঋষিদের মতো, তিনি সেই ভারতীয় যিনি অবশ্যই মনে করতেন যে, পৃথিবীটা কেবল বীরভোগ্যা নয়। পৃথিবীতে সকলেরই বাঁচার অধিকার আছে। ভারতীয় শাস্ত্রের শিক্ষা ঈশ্বরচন্দ্র অবহেলা করতে পারেন না। মাইকেল মধুসূদন বিদ্যাসাগরের যে মূল্যায়ন করেছেন, তা রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর কৃত

বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস ও মাতা ভগবতী দেবী।

মূল্যায়নের মতো এতটা সুগভীর না হলেও বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি স্পর্শ করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬) : বিদ্যাসাগরের থেকে বয়সে ১৬ বছরের ছোট। প্রয়াণও হয়েছে বিদ্যাসাগরের প্রয়াণের ৫ বছর আগেই। কিন্তু যে ৫০ বছর ধরে এই ধরায় ছিলেন, একটি সর্বাপেক্ষা সহজ ও সর্বাপেক্ষা সুন্দর দিশা পৃথিবীকে দিয়ে গেছেন। তাঁর অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণতা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রদ্ধাযুক্ত হলেও ওই পথে পা বাড়াননি। নিজের প্রবল বেগ নিয়ে তিনি মানুষের হিতে নিজের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কৃত চর্চায় মনোনিবেশ করার মন ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র যে বিশেষ কোনো দেবদেবীর ভক্ত ছিলেন তাও নয়। মানুষের হিত করলেই দেবার্চনা হয়, মায়ের কাছে এই শিক্ষাই তিনি পেয়েছিলেন। যে শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর ভক্তরা 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' বিবেচনা করতেন, সেই ভগবানকেও বিদ্যাসাগরের দর্শন পেতে, তাঁর কাছে আসতে হয়েছিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁর দর্শনপ্রার্থী তাঁকেও কি বিশ্বের প্রেক্ষিতে একনম্বর মানুষ বলা যায় না?

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের ১৮ বছর পর আর এক ঋষির জন্ম হয় এই সুপবিত্র বঙ্গভূমিতে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। প্রয়াত হয়েছেন অল্প বয়সে। কিন্তু এই সামান্য সময়ের মধ্যেই তিনি একাধারে ঋষি ও সম্রাট। বাংলা গদ্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র। কিন্তু বাংলা গদ্যকে এক অপরূপা সুন্দরী যুবতীতে পরিণত করার কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের।

বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি প্রবাদে পরিণত। অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভূমির প্রতি ভক্তির শিক্ষা দিলেন। উভয়েই ভারতবর্ষের জ্ঞান-গরিমা, সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রতি অনুরাগী।

LAUREL

FINANCIAL SOLUTIONS

PRAKASH PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member : The National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(Investment & Mutual Funds Advisor)

JAIN BAID & COMPANY

(Chartered Accountants)

312/313, Todi Chambers, 2, Lal Bazar Street, Kolkata-700 001

Phone Nos. 2230 0405, 2230 5846, Fax : (033) 2248 1576

E-mail : prakash_laurel@yahoo.com

With Best

Compliments:-

Anderson Wright International

With Best

Compliments:-

Monoj Kumar Kakra

Krishna Bangles

37, Biplabi Rashbehari Bose Road

2nd floor, Kolkata-1

M : 9831280306

বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন। মিল, বেন্থাম, কোঁতে প্রমুখের দর্শন ও মতবাদ বঙ্কিমের অতি প্রিয় পাঠ্য ছিল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, দেশি-বিদেশি শাস্ত্র— সবই বঙ্কিমের অধিগত ছিল। এত কিছু পাঠের অবসর বিদ্যাসাগরের ছিল না। তবু বঙ্কিম যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, বিদ্যাসাগর অনেক আগেই সেই পথে জীবন কাটিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্মতত্ত্ব প্রবন্ধে লিখেছেন— ''ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্য জীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহা হিন্দু ধর্মের প্রকৃত মর্ম। অন্য ধর্মে তাহা হয় না। এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ। কেবল হিন্দু ধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ— সকল লইয়াই ধর্ম। এমন সর্বব্যাপী সর্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম কি আর আছে?''

অনেকেই ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মচিন্তা নিয়ে ভাবিত থাকেন। উপরোক্ত মানবহিতৈষণার ধর্মই ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্ম। বঙ্কিম যা বিস্তৃতভাবে লিখিত আকারে, সর্বসমক্ষে এনেছেন, সময়াভাবে ঈশ্বরচন্দ্র তা করেননি। তবু বলি, বহুগুণে গুণান্বিত বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে অক্ষয় মনুষ্যত্ব, কুসুমের মতো কোমল মন ততখানি দৃশ্যমান নয়, যতখানি প্রাচীন ঋষিদের বৈদগ্ধ্য ও অজেয় পৌরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগরের গদ্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য হল, 'বিশেষত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁর পূর্বে কেহই এরূপ মধুর গদ্য লিখিতে পারেন নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারেন নাই' (প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকাতে লিখেছেন)।

সেই যুগের আর এক প্রখরধর্মী ভারতবাসী ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০)। এই মারাঠী ভারতীয়টিকে ইংরাজরা ভয় পেত। প্রায়ই কারাবাসে পাঠিয়ে দিত। বলতো, Father of unrest। যত বিদ্রোহ, বিপ্লব, অসন্তোষ ইংরাজদের বিরুদ্ধে তৈরি হতো তিলক ছিলেন তার জনক। তিলকের হোমরুল আন্দোলন ইংরাজদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করেছিল। গান্ধী-পূর্ববর্তীকালে তিলক ছিলেন সৎ, ধর্মপ্রাণ, স্বাধীনতাকামী, ক্রিয়াশীল এবং দায়িত্বশীল রাজনীতিক। সম্ভবত ওই চরিত্রের রাজনীতিক ১৯২০ সালের পরে, সুভাষ বোসের উদয়ের আগে আর কেউ ছিলেন না। তিলককে ইংরাজরা ভয় পেত বলেই তাঁর বারবার জেল হতো। যে অপরাধে গান্ধীজীর দুবছরের সাজা হয়েছিল (ছয়মাস পরেই ছেড়ে দেওয়া হত) সেই অপরাধে তিলকের জেল হয়েছিল ৬ বছর বা ৮ বছর এবং তাও মান্দালয়ে। তিলকই ভারতের মানুষকে শিখিয়েছিলেন, 'স্বাধীনতা আমার জন্মাধিকার'। মাতৃভূমির জন্য জীবনপণ করার শিক্ষা দেওয়া ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিলকের একমাত্র কাজ ছিল। তিলকের ভয়েই ইংরাজরা ভারতে একজন নেতা খুঁজছিল যে মনে প্রাণে বৃটিশ সমর্থক হবে ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনগুলিতে কৌশলে জল ঢেলে দিতে পারবে। ইংরাজরা সেরকম নেতা তৈরি করে নিয়েছিল। তিলকের অগাধ গুণ ছিল, পাণ্ডিত্য ছিল, দেশপ্রেম ছিল, তেজস্বিতা ছিল, দৃঢ়তা ছিল, মনুষ্যত্ব ছিল। কিন্তু তিনি সব কিছুই সমর্পণ করেছিলেন দেশকে স্বাধীন করার আন্দোলনে। বিদ্যাসাগরের যুগে যে আন্দোলন শুরুই হয়নি। তিলকের প্রতিভা ছিল একমুখী— ভারতের স্বাধীনতা।

বিদ্যাসাগরের থেকে প্রায় ৪০ বছরের ছোট রবীন্দ্রনাথকে (১৮৬১-১৯৪১) আমরা পেলাম, যিনি বাঙালি হয়েও বিশ্ববরেণ্য হয়েছিলেন। তাঁর মানবহিতৈষণার পরিকল্পনা ছিল সমাজকেন্দ্রিক, ততটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। বিদ্যাসাগর যে শিক্ষা-সংস্কার ও শিক্ষাপ্রসারের সূচনা করেছিলেন, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্য সৃষ্টি করেছিলেন, তাকে বিশ্বসুন্দরী করলেন রবীন্দ্রনাথ। সমাজের অবহেলিত অনুন্নতদের প্রতি বিদ্যাসাগরের যে ভালবাসা ছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই ভালবাসাকে ভিত্তি করেই তাদের আর্থিক সঙ্গতি সৃষ্টি করতে সমবায় প্রথার সাহায্য নিয়েছিলেন।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জয় করে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী ব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছেন। বিদ্যাসাগর বিশ্ব স্বীকৃতি পাননি তার বহুমুখী বহুব্যাপ্ত কর্মধারার কারণে। রবীন্দ্রনাথের কালে যে প্রচার সুযোগ ছিল, বিদ্যাসাগরের কালে তা ছিল না। বিশ্ব স্বীকৃতি পেয়েও বিদ্যাসাগরকে অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর অনেক ধরনের বৃক্ষের অঙ্কুরোদগম করিয়ে চারা রোপণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবৃক্ষে রূপান্তরিত হন যদিও তাঁর চিন্তন মনন সবই ছিল বিচিত্র পথগামী। বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও মনন জগতে বাস করতেন, নিজ তত্ত্বে সমৃদ্ধ ছিলেন ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই।

কিছুকাল পরে আর এক বিশ্বজয়ী বাঙালিকে পাওয়া গেল স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। মাত্র ৩৯ বছর বেঁচেছিলেন। তাতেই পৃথিবী তাঁকে দেখে চমৎকৃত, বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। যে হিন্দুত্ব বিদ্যাসাগরের মধ্যে সুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে কিছুটা দীপ্ত হয়েছিল, সেই হিন্দুত্বকে জগৎসভায় প্রথম স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিবেকানন্দ।

জীবসেবাই শিব সেবা— যে কথাটি মুখে না বলে, হাতে কলমে কাজ করে বিদ্যাসাগর দেখিয়েছিলেন, বিবেকানন্দ সেটি মুখে বললেন এবং তার স্থায়ী রূপ দিতে মঠ সৃষ্টি করলেন।

ইতিমধ্যে ফরাসি দেশে জন্মেছিলেন মোপাসাঁ (১৮৫০-১৮৯৩)। তিনি ছোট গল্প লেখক হিসাবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বহুমুখী প্রতিভা ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না। তবু একমুখী প্রতিভার জোরেই তিনি বিশ্বখ্যাত। আর বহুমুখী প্রতিভা ও কর্মকাণ্ড থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের নাম বিশ্বে অনালোচিত। বাংলা ভারত ভূখণ্ডের অংশ না হয়ে ফ্রান্স বা ইংল্যান্ডের মতো একটি দেশ হলে কী হতো বলা যায় না। আর বড় কথা হলো, খ্যাতি পাওয়ার জন্য যে পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয়, বিদ্যাসাগরের তা ছিল না। তিনি তার তোয়াক্কাও করেননি।

গুজরাট প্রদেশজাত এক ভারতীয় সারা বিশ্বে পরিচিত। তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)। বিদ্যাসাগরের জীবনসায়াহ্নে এঁর জন্ম। প্রতিভা ও বৈদগ্ধ্য, কর্মোদ্যম ও হৃদয়বত্তায় তিনি বিদ্যাসাগরের থেকে অনেক পিছনে। অজেয় পৌরুষ ও অখণ্ড মনুষ্যত্বের গর্বও তাঁর ছিল না। তবু বিশ্বজোড়া খ্যাতি হয়েছিল। এর পিছনে যে রাজনীতি ও কূটকৌশল ছিল এখানে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। শুধু এইটুকুই মনে রাখতে হবে যে বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত এমন একটি যন্ত্র যা বড় জিনিসকে ছোট করে দেখায়।

বিদ্যাসাগর বিনা সংগঠনে অনেকগুলি সামাজিক আন্দোলন একাই করেছিলেন। আন্দোলনগুলি শতভাগ সফল হয়েছিল। তাঁর খ্যাতি হয়েছিল, সমাজের লাভ। মোহনদাস বিরাট সংগঠন নিয়ে অন্তত তিনটি আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর খ্যাতি হয়েছিল, সমাজের ক্ষতি হয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন ৫০ এবং মধ্যগগনে অবস্থান করছেন, তখন রাশিয়ায় এক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির জন্ম হয়— ভি আই লেনিন (১৮৭০-১৯২৪)। বিখ্যাত রুশ বিপ্লব তাঁর সৃষ্টি এবং পরিচালনা। পূর্বকথিত মার্কসবাদের সার্থক রূপায়ণে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের অল্প কিছুকাল পরেই তাঁর প্রয়াণ হয়।

বিদ্যাসাগরের প্রজ্ঞা, মেধা, কোমল হৃদয়ে অজেয় পৌরুষ এবং অক্ষয় মনুষ্যত্ব হয়তো তাঁর মধ্যে পূর্ণভাবে দেখা যায় না, তবে সমাজে বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের কল্যাণার্থে যে মার্কসীয় তত্ত্ব তাঁর জন্মের মাত্র ২২ বছর আগে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বিধৃত হয়েছিল, দাস ক্যাপিট্যাল গ্রন্থে (মার্কস) ব্যাখ্যাত হয়েছিল তার সফল প্রয়োগের চেষ্টা তিনিই করেছিলেন। রাশিয়া এবং বিশ্বের শোষিত শ্রমিকশ্রেণী, মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে বিপ্লব করে কী উপকার পেয়েছিল এবং মার্কসীয় তত্ত্ব কতটা সফল বা বিশ্ববাসী কতটা গ্রহণ করেছে তা বিস্তৃত আলোচনার বিষয়। তবে লেনিন তার প্রয়োগ করতে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং স্বদেশের অর্থনীতিতেই শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা এখন একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত। মার্কসবাদের সঙ্গে লেনিনবাদ একটি পরিপূরক মতবাদ হিসাবে বিশ্বের কমিউনিস্টরা গ্রহণ করেছেন।

ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ালভ (লেনিন)-এর সময়কালে আর এক অনন্য প্রতিভা এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন— শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০)। পাণ্ডিত্য, দার্শনিক দৃষ্টি এবং বিপ্লববাদিতা যা স্বদেশপ্রেমেরই একটি রূপ, একাধারে এই মানুষটির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তবে বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে যেমন আমরা বলতে পারি, তাঁর জীবনই তাঁর বাণী, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ পরবর্তীকালে ঋষি অরবিন্দ হয়েছিলেন ঠিকই তবে তাঁর জীবনই তাঁর বাণী— একথা সর্বাংশে বলা যায় না। বিদ্যাসাগর কথিত অর্থে কোনো ঋষি বা যোগী বা দার্শনিক ছিলেন না। তবে বিদ্যাসাগর যা ছিলেন, কোনো ঋষি বা যোগী বা দার্শনিক তা ছিলেন না।

ঈশ্বরচন্দ্রের সমসাময়িক না হলেও সেই শতাব্দীতে তাঁর মৃত্যুর কয়েকবছর আগে দুই বিশ্ববিখ্যাত মানুষের নাম পাওয়া যায়। সমারসেট মম (১৮৭৪-১৯৬৫) এবং টমাস মান (১৮৭৫-১৯৫৫)।

ফরাসি দেশের মানুষ মম বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর সাহিত্য প্রতিভার গুণে। আর টমাস জার্মানির মানুষ। তাঁর খ্যাতি বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যিক হিসাবেই। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জার্মান ঔপন্যাসিক ছিলেন টমাস মান। ১৯২৯ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ছিল হিটলারের ন্যাৎসিবাদের বিরোধিতা, যার জন্য একসময় তিনি দেশত্যাগ করেন। মম-এর সাহিত্যকীর্তি তাঁকে নোবেল জয়ী করেনি ঠিকই, তবে তাঁকে সে যুগে ফ্রান্সের সেরা ঔপন্যাসিক, সেরা নাট্যকার ও সেরা ছোটগল্পকারের সম্মান দিয়েছিল। প্রকাশ্যতই, এঁরা যতই বিশ্বখ্যাত হউন না কেন, বিদ্যাসাগরের বহুমুখী প্রতিভা, বহুমুখী কর্মউদ্যোগ এবং প্রবল পাণ্ডিত্য ও ততোধিক প্রবল কাণ্ডজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

আর এক বিশ্বখ্যাত ব্যক্তির নাম এই সূত্রে অনুল্লেখ রাখা অনুচিত হবে। তিনি হলেন রাশিয়ার লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০)। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে

একজন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনা অবান্তর। ধনীর সন্তান তথা ধনীও বটে। তবে জীবনযাত্রায় আড়ম্বর ছিল না। কেবলমাত্র সাহিত্য প্রতিভা ব্যতীত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনীয় অন্য কোনো গুণবত্তার কথা জানা যায় না।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিদ্যাসাগরের প্রয়াণের পরে অপর দুইজনের উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন। তাঁদের মধ্যে প্রথমজন মাও-সে-তুঙ্ বা মাও-জে-দঙ্ (১৮৯৩-১৯৭৬)। মার্কসবাদী এই বিপ্লবীর নাম মানুষের মুখে মুখে। মার্কসবাদ লেনিনবাদের মতো তিনিও এক তত্ত্ব রেখে গেছেন, যাকে লোকে মাওবাদ নামে চেনে। চীনের বিপ্লব তাঁরই নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এবং ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন নবগঠিত চীন প্রজাতন্ত্রের প্রধান (চেয়ারম্যান)। মার্কসবাদ মুখ্যত শ্রমিকদের নেতৃত্বে বিপ্লবের তত্ত্ব প্রচার করলেও, মাও দেখালেন যে শহরের শ্রমিক নয়, গ্রামের কৃষকরাই প্রধান শক্তি। বিপ্লব তাদের সংগঠিত করেই করতে হবে। মাও একজন সফল বিপ্লবী ও রাষ্ট্রনেতা হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে পরিচিত থাকবেন। পাঠকরা সহজেই মাও-সে-তুঙ্-য়ের মানসিকতার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মানসিকতার পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারছেন। তাই বিশদে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

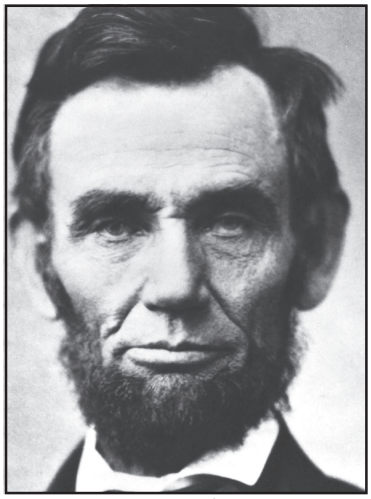

আব্রাহাম লিঙ্কন

দ্বিতীয় যে ব্যক্তি ওই শতাব্দীর শেষে জন্মগ্রহণ করে বিশ্বকে চমৎকৃত করেছিলেন তিনি হলেন সুভাষচন্দ্র বোস। জন্ম ১৮৯৭ সালে। মৃত্যুর তারিখ নির্ণয় করা যাবে না, কারণ তা রহস্যাবৃত। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ১৯৪৫ সালে তাইহোকুতে এক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হয়েছেন বলে যে রটনা তা সর্বাংশে অসত্য। কারণ ওই সময় ও তারিখে ওই স্থানে কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি বলে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। দেশভক্তি, স্বাধীনতা এবং তার জন্য সর্বস্ব পণ করার যে আবেগ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে বলেছিলেন, তিলক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং ভারতের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ যে তত্ত্ব নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন, সুভাষচন্দ্রও সেই পথের পথিক। ভারতবর্ষ থেকে ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদ সুভাষ বোসের বিক্রমের কারণে ঘটেছিল বলা যায়।

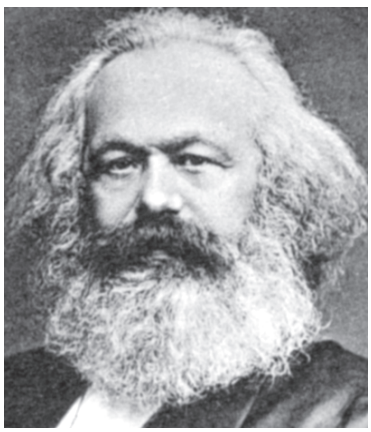

কার্লমার্কস

বিদ্যাসাগরের পবিত্র কর্মগুলির পরিধি বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে সময় তার থেকে বেশি হওয়াও অসম্ভব ছিল। কিন্তু সুভাষ বোসের কর্মপরিধি সারা ভারত ও বিশ্বে বিস্তৃত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রর প্রতিভাও ছিল একমুখী— দেশের স্বাধীনতা অর্জন।

অবিভক্ত বাংলা বা এখনকার রাজ্য ভারত রাষ্ট্রের একটি অংশ। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানির মতো কোনো পৃথক রাষ্ট্র নয়, যদিও আকার আয়তনে জনসংখ্যায় চিন্তনে-মননে বৈদগ্ধ্য ও বিজ্ঞতায় ঐসব দেশগুলির তুলনায় কোনো অংশেই খাটো নয়, তবু পৃথিবী ভারতবর্ষকেই হিসাবে আনে। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো মহানদের পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার দায় ছিল রাষ্ট্রেরই। কিন্তু এই দেশের রাষ্ট্রনায়করা এই দেশের পরিচয় দেন কেবলমাত্র একজনকে দিয়ে। যার কারণ মানসিক দারিদ্র্য।

রামমোহন, বিদ্যাসাগরের নাম বিদেশিরা দূরস্থান, আমাদের দেশের মানুষরাও বিশেষ জানেন না। পাঠ্যতালিকা ও পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে আমাদের প্রজন্মের কাছে আমরা এঁদের তুলে ধরি না। ৫ সেপ্টেম্বর যদি শিক্ষক দিবস হতে পারে ২৬ সেপ্টেম্বর তবে কেন শিক্ষাদিবস হতে পারে না? বিদ্যাসাগর রাষ্ট্রপতি ছিলেন না বলে? ২২ মে কেন রামমোহন দিবস রূপে সারা ভারতে পালিত হবে না? হবে না, কারণ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ঋণ স্বীকারে স্বীকৃত নই। ভারতবর্ষ যেন ১৯৪৭ সালের আগে ছিল না, ১৯৪৭ সালে ভূমিষ্ঠ হয়েছে!

বিদ্যাসাগরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর 'নিজস্ব' বোধ। আমরা পরানুকরণকারী। নিজত্ব কাকে বলে আমরা জানি না। সাধারণভাবে আমরা সমাজে কল-চালিত পুতুলের মতো। জটিল কৃত্রিমতার বন্ধনে আবিষ্ট হয়ে পড়েছি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়, 'আমাদের ভিতরকার আসল মানুষটি জন্মাবধি প্রায় সুপ্তভাবেই কাটাইয়া দেয়।

Saraogi Udyog Private Limited

Importer & Merchants for Coal and Coke

21, Hemant Basu Sarani "Centre Point" Suit No. 212

2nd Floor, Kolkata - 700 001

Fax : +91-33-22435334, +91-33-22138782

Phone : +91-33-22481333 / 0674, +91-33-2213 8779/80/81

Email : saraogiudyog@eth.net

www.saraogiudyog.com

With Best Compliments From

A Well Wisher

তাহার স্থানে কাজ করে একটা নিয়মবাঁধা যন্ত্র। যাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাহাদের সেই প্রবল ব্যক্তিত্বকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ইঁহারাই নিজের চরিত্র পুরীর মধ্যে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পান। অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নাম 'নিজত্ব'। মহৎ ব্যক্তিরা এই নিজত্ব প্রভাবে একদিকে স্বতন্ত্র, একক; অন্যদিকে সমগ্র মানবজাতির সবর্ণ, সহোদর।'

'আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়েরই এই 'নিজত্ব'র পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে যেমন তাঁরা ভারতবর্ষীয় তেমনি অপরদিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাই, যাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নয়।'

'বিদ্যাসাগরের পিতামহ দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। ফলে নাতিকে কোনো সম্পত্তি দিয়ে যেতে পারেননি। কেবল যে সম্পদের উত্তরাধিকার একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্র-মাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছেন'।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বিদ্যাসাগরের প্রতিভা ছিল বহুমুখী— যা তাঁর সমসাময়িক বিশ্বের অন্য মহান ও বিখ্যাত চরিত্রগুলির মধ্যে লভ্য নয়, অন্তত সহজলভ্য নয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) আজ থেকে ১২০ বছর আগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন, ''বিদ্যাসাগরের প্রকাণ্ড মানবতাকে সঙ্কীর্ণ বাঙালিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়।''

পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর কেবলমাত্র বাংলার বা কেবলমাত্র ভারতের নন, তিনি বিশ্বের সম্পদ। রামেন্দ্রসুন্দর তাই লিখেছেন, 'অণুবীক্ষণ নামে এক যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়। ... কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ।'' অর্থাৎ যাঁদের আমরা ঢক্কানিনাদে অনেক বড় করে দেখাই, তাদের অত্যন্ত ছোট দেখাবে যদি বিদ্যাসাগরের চরিত্র-মাহাত্ম্যের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করি। রামেন্দ্র লিখেছেন, 'এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায় শীর্ষে তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে, কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।' রামেন্দ্রসুন্দর তদানীন্তন বাঙালি বা ভারতীয়দের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বলেছিলেন। আমার মনে হয়, সারা বিশ্বের প্রেক্ষিতেও রামেন্দ্রসুন্দরের এই মূল্যায়ন একইরকম সত্য। সত্যই বিদ্যাসাগরের মেরুদণ্ডের মতো মেরুদণ্ড দুর্লভ। জীবনের কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদক্ষেপে এই মেরুদণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়। যে পুরুষকার পুরুষের পৌরুষ, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। 'দুঃখ অনেকের ভাগ্যেই ঘটে, জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টক সমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এই রূপে কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। তাহার সমগ্র জীবনকেই, নিজের জন্য না হউক পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।'

অনেক অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার পর কর্তব্য নির্ণয় করা সাধারণ মানুষের অভ্যাস। বিদ্যাসাগর কর্তব্যে ধাবিত হতেন নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্তিটা স্বভাবের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছিল যে তাঁকে আর স্বভাব থেকে পৃথক করা গেল না।

বিদ্যাসাগরের নিজত্ব এতই প্রবল ছিল যে, অনুকরণ করে কোনো পরত্ব গ্রহণ করা বা প্রভাবিত হওয়ার প্রয়োজন পড়েনি।

রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন, 'সেই দুর্দাম প্রকৃতি, যাহা ভাঙিতে পারিত, কখনো নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে, সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখনো ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই, সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্বপ্রকার কপটাচার হইতে আপনকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নেই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনন্যতা এই দুর্দ্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ বিরল। (বিদ্যাসাগর স্মরণ সভায় ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ প্রদত্ত ভাষণ)।

বিদ্যাসাগরের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। এই বহুমুখী প্রতিভা প্রসঙ্গে আলোচনায় যাওয়ার আগে বিদ্যাসাগরের এক স্বাভাবিক প্রবণতার উল্লেখ করে নিতে চাই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকট নিজে প্রধান দয়ার পাত্র সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে দয়া করিয়াছেন। তিনি যখন যে অবস্থায় পড়িয়াছেন নিজের কোনো প্রকার অসচ্ছলতা তাঁহাকে পরের উপকার করা হইতে বিরত করিতে পারে নাই। অনেক মহৈশ্বর্যশালী রাজা রায় বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারেন নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই 'দয়ার সাগর' নাম বঙ্গদেশে চিরকালের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন। (পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এই ধরনের উপাধিধারী কাহারও নাম শোনা যায় না। —লেখক)।

'পরের উপকারে তিনি নিজের সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। প্রকৃত দয়া পুরুষের ধর্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য ও কঠিন অধ্যবসায় প্রয়োজন। দয়ার সহিত বীর্যের সম্মিলন না হইলে সে দয়া অনেকস্থলেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগরের দয়ার মধ্যে একটি নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বিদ্যাসাগরের কারুণ্যে কাপুরুষতা ছিল না, ছিল পৌরুষের লক্ষণ।'

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের বিশ্লেষণে মূল্যায়নে উল্লেখ করেছেন যে, বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠতা কেবল তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিদ্যাসাগরের ওই বলিষ্ঠতা তাঁর হৃদয়বৃত্তিতেও ছিল। এই বলিষ্ঠতাকে বিদ্যাসাগরের কাণ্ডজ্ঞান বলা যায়। এবং এই কান্ডজ্ঞান তাঁর কর্মবুদ্ধি ও ধর্মবুদ্ধি দুটিতেই উপস্থিত থাকত।

বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা, বহু বিবাহ নিবারণ, নারীদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা, এমনকি সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষা ও মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন সৃষ্টি--- সবই এই সবল কাণ্ডজ্ঞানের পরিণতি। ইংরাজরা যাকে Pragmatism বলে। সেই অর্থে বিদ্যাসাগর একান্তভাবেই Pragmatic, কিন্তু এই Pragmatism (ব্যবহারিক বা বাস্তবমুখী বা প্রয়োগমুখী দৃষ্টিভঙ্গী)-এর সঙ্গে হৃদয়বত্তা যুক্ত করলে ইংরাজিতে কোনো শব্দ পাওয়া যাবে না হয়তো। বিদ্যাসাগরের Pragmatism কেবলমাত্র শুষ্ক বুদ্ধি ও যুক্তির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। এটি উৎসারিত হয়েছিল হৃদয়বৃত্তি থেকে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্ভবত এই কারণেই বিদ্যাসাগরের মূল্যায়নে লিখেছেন, বিদ্যাসাগরের হৃদয় ছিল Heart of a bengali Mother, বাঙালি জননীর হৃদয়ের মতো। এই বাঙালি জননীর মতো কোমল হৃদয়সম্পন্ন কোনো Pragmatic মানুষের সন্ধান বিশ্বের সেরা মানুষদের মধ্যে কেউ খুঁজে বের করতে পারবেন? তাই বিদ্যাসাগর শুধু বাঙালিদের মধ্যে বা ভারতীয়দের মধ্যে অনন্য নন, সারা বিশ্বেই অনন্য।

'বিদ্যাসাগর যে মননলোকে বাস করিতেন আমরা তাহা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। তাঁহার চিন্তা ও চেষ্টা, বুদ্ধি ও বেদনা গতানুগতিকের ছিল না, তাহা পারমার্থিক ছিল। আমাদের পক্ষে

বিদ্যাসাগরের জন্মভিটা।

স্বার্থ যেমন প্রবল, বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে পরমার্থ ততোধিক প্রবল ছিল।' বিদ্যাসাগর ছিলেন সৈন্যহীন সেনানায়কের মতো। কাউকে গ্রাহ্য না করেই জীবন রঙ্গভূমির প্রান্ত পর্যন্ত জয়ধ্বজা নিজের কাঁধেই বহন করেছেন। তিনি কাউকে ডাকেননি, কারোর সাড়াও পাননি। বাধা ছিল পদে পদে। তা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন সেই সব কাজ যা তিনি করণীয় মনে করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের মতো বীরপুরুষ বিশ্বে বিরল। এই যে 'বীর' শব্দটি লিখলাম, ইংরাজিতে সেই শব্দটি হল Hero। এই বীর বা হিরো আমরা কাকে বলব? কার্লাইল বীর বা হিরোর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন— The hero is he who lives in the inward sphere of things, in the True, Divine and Eternal, which exists always unseen to most, under the temporary, trivial।

'স জীবতী মনো যস্য মননেন হি জীবতি'। এই মননজীবীরা পরামর্থকে সহজভাবে অনুমান করেন এবং তার দ্বারা অনায়াসে পরিচালিত হন।

ঠিক এই কারণেই বিদ্যাসাগর পাণ্ডিত্যের দ্বারা ধনোপার্জন করে সংসারে যথেষ্ট সম্মান প্রতিপত্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারতেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে মনোজীবন বা অধিক জীবন ছিল তা এতে সন্তুষ্ট হত না।

রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের স্মরণসভায় যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন (বাংলা ১৩০২, ১৩ শ্রাবণ) সেই প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন, 'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাঁহার প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ ও অখণ্ড মনুষ্যত্ব।' এই অজেয় পৌরুষ ও অখণ্ড মনুষ্যত্বের দ্বিতীয় কোনো মূর্তি পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে লভ্য কি?

বরাবরই লিখে আসছি যে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভা ছিল বহুমুখী ও বহুব্যাপ্ত। তিনি সারা বিশ্বে একক এবং অনন্য। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও কর্মকাণ্ডের একটি অতি সংক্ষিপ্তরূপ হিসাবে উল্লেখ করা যায়— মানব হিতৈষণা, বাংলা গদ্য সৃষ্টি, শিক্ষাসংস্কার, উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা, নারীদের শিক্ষা ব্যবস্থা, সংস্কৃত পাঠের সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষা আবশ্যিক করা, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহু বিবাহ নিবারণ ইত্যাদি।

ঊনবিংশ শতাব্দী (বিদ্যাসাগর শতাব্দী)-তে কয়েকটি দেশের আয়তন ও লোকসংখ্যা

দেশের নাম	আয়তন (ব. মা.)	লোকসংখ্যা (কোটি)
ইংল্যান্ড	৯৪২১২	২.২৪
ফ্রান্স	২১১২০৭	২.১২
জার্মানি	১৩৬৯৮৫	৩.০৮
ইতালি	১১৬০০০	২.১৬
রাশিয়া	৮৮০০০০০	১০.০৪
আমেরিকা	৩৬২৮০৬২	২.৩২
বাংলা	আনু. ২০০০০০	আনু. ৭.০০
ভারতবর্ষ	১২৬৪৫৫৫	২৭.৩৬

(পরিসংখ্যান সূত্র : শ্রী প্রশান্ত প্রামাণিক)

বিদ্যাসাগর চরিত্রে অগণিত গুণের জটিল সমাবেশ ঘটেছিল এবং যাবতীয় বাধা তিনি একক মাহাত্ম্যে বলিষ্ঠ, দীর্ঘ পদক্ষেপে অতিক্রম করেছেন। তাঁর ধীশক্তি, মেধা, পাণ্ডিত্য ছিল কিংবদন্তী, যথার্থ মর্যাদাবোধ, স্বজাতির অভিমান, ন্যায়পরাণয়তা, করুণা, কঠোরতা তাঁর জীবনকে সকলের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় করেছে।

পরিশেষে আমার মনে হয় বিদ্যাসাগর স্তুতিই বা তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা ঠিক হবে না। বিদ্যাসাগর নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন। সারা বিশ্বের মহান ব্যক্তিদের সঙ্গে তুলনা করে বিদ্যাসাগরকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠদের আসনে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের আশু কর্তব্য। একাজ কঠিন হলেও অসাধ্য নয়। বিশ্বের দরবারে বিদ্যাসাগরকে প্রতিষ্ঠা করে তাঁর দ্বিশত জন্মবার্ষিকীতে (২০১৯) ইংরাজি ও বাংলা ভাষায় পুস্তক প্রকাশ করতে পারলে উপযুক্ত ও যথার্থ কাজ করেছি বলে মনে করতে পারব। একাজে এখনও কেউ ব্রতী হননি। আমরা ব্রতী হতে পারি।

An ISO 9001 : 2008 Certified Company

Alloy Group

UTSAV INDUSTRIES PVT. LTD.

AIM TECHNOLOGIES PVT. LTD.

RAJ ALUMINIUM PVT. LTD.

Aluminium & Hardware People

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED

AN ISO 9002 COMPANY

NALCO Aluminium Sheet Coil

ALOM Aluminium Extruded Section

503, **Kamalalaya Centre,** 156/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013. INDIA

Fax : +91-33-2215 0455, 3040 8730

E-mail : alloy@cal3.vsnl.net.in **Website :** www.alloyindia.com

With Best Compliments from :

R. C. Bhandari

Advisor, Mutual Funds

36, Basemant, 8, Camac street

Kolkata–700017

Tel. No. 2282 7928